নীলাঞ্জনা

আশাপূর্ণা দেবী

নীলাঞ্জনা

আশাপূর্ণা দেবী

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৭৩

প্রচ্ছদ :
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
সরোজকুমার চক্রবর্তী
শ্রীবিষ্ণু প্রেস
২৩এ, ওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

॥ তিন টাকা মাত্র ॥

নীলাঞ্জনা

তোমাকে
বিশ্বনাথ মুখার্জী

ছায়া ছায়া ঝাপসা ঝাপসা পর্দায় ঘোরা-ফেরা করে বেড়াচ্ছে কয়েকটা আলোক বিন্দু।...যেন আশ্বাসের ইসারা।

বিন্দুগুলো উঠছে নামছে...আসছে যাচ্ছে...হঠাৎ মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার এক সময় একটা উজ্জ্বল আলোক কণিকা ছোট্ট দুষ্টু মেয়ের মত 'টু' দিয়ে উঁকি মেরে বলছে 'আমায় ধরতো দেখি!'

ওই আলোর কণিকাগুলোকে মুঠোয় চেপে ধরে দানা বাঁধাতে চেষ্টা করছেন কথাশিল্পী বিম্বিসার রায়, পারছেন না! হাত ফসকে পালিয়ে যাচ্ছে ওরা। ক'দিন ধরে তাই কলমটা নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে, লেখা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না জানেন না।

খণ্ড ছিন্ন ভগ্ন কতকগুলো প্লটের টুকরো শুধু বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাসছে ঝাপসা ঝাপসা মনের পর্দায়।

অথচ তাগাদার পর তাগাদা আসছে, একদিক থেকে নয়, অনেক দিক থেকে, একজনের কাছ থেকে নয়, অনেক জনের কাছ থেকে।

আজ তাই নিতান্তই মনের জোর করে কলম নিয়ে বসেছিলেন বিম্বিসার রায়।

আজ লিখবেনই।

মনের মধ্যে গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে—কবে যেন শোনা, কার যেন একটা কবিতার লাইন...'আজ কিছু লিখবই, আজ কিছু লিখতেই হবে।'

'আজ কিছু লিখবই, আজ কিছু লিখতেই হবে।' কিন্তু সে লেখা কি কাগজের সম্পাদকের প্রসারিত হাতের জন্যে লেখা? নীলাঞ্জনা যদি দেখতো, নিশ্চয় ওর সেই ঝলসে ওঠা হাসি হেসে উঠে বলতো, 'বিম্ব, তুমি না শিল্পী! তুমি না জীবন রসিক! তুমি শুধু

তাগাদার তাড়নায় লেখ ? যে তাগাদা, একহাতে টাকার থলি, আর অপর হাতে অনুরোধের থালা নিয়ে এসে দাঁড়ায় ! নিজের মধ্যে প্রেরণা নেই তোমার বিম্ব ?'

বিম্বিসার কলমটা কামড়ালেন।

কতদিন হয়ে গেল ওই তাগাদার লেখা ছাড়া অন্য কোনো লেখা লিখতে পান নি। পান নি ওই বিক্ষিপ্ত আলোক কণাগুলিকে মুঠোয় ভরে ফেলতে।

কতদিন পাননি ভিতরের প্রেরণায় লিখতে।

অবিরাম বাইরের তাড়না 'লেখা কই ? লেখা কই ?' বহুবল্লভের যন্ত্রণাই এই। বিম্বিসার রায় বহুবল্লভ সাহিত্যিক।

বিম্বিসারের লেখা না থাকলে নতুন পুরনো ছোট বড়, বামপন্থী দক্ষিণপন্থী সব পত্রিকারই জীবন মিথ্যে। বিম্বিসারের প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব।

তাই বছরে দশটা উপন্যাস লিখতে হয় বিম্বিসারকে, ষাটটা গল্প।

বিম্বিসার রায়ের আয় নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলে সাহিত্যগন্ধী মহলে।

আর বিম্বিসারের সঙ্গে দেখা হলেই বান্ধবরা বলে ওঠেন, 'কী ? কটা উপন্যাস চালাচ্ছ একসঙ্গে ?'

বলে।

শুধু বন্ধুরা নয়, যারা ঢেঁকি গেলায়, তারাও বলে।

এত লিখলেন—

তবু ?

তবু আজ পর্যন্ত বিম্বিসার কি নীলাঞ্জনার গল্পটা লিখতে পেরেছেন ?

যে নীলাঞ্জনা কথা বললেই মনে হতো ওর সব মুখটা হাসছে।

আর যে নীলাঞ্জনার চোখের তারাটা ঠিক শিশুর মত নীলাভ ছিল।

সেই নীলাঞ্জনা বলতো, 'শুধু কয়লাই কাটবে বিম্ব ? খনির নীচে হীরের সন্ধান করবে না কোনো দিন ? কয়লা-তোলা কুলির সঙ্গে তবে তফাৎ কি রইল তোমার ?'

বিম্বিসার সেদিন হেসে উঠেছিল না ?

যুবক বিম্বিসার।

উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিক। যাকে নিয়ে তখনি বেশ আলোড়ন উঠেছিল। সে বলেছিল 'তুমি বড় ভাবপ্রবণ নীলাঞ্জনা !'

নীলাঞ্জনা তার চকচকে চোখ তুলে চেয়েছিল, কথা বলে নি।

বিম্বিসার তার অভিমান ভাঙাতে বলেছিল 'তোমার গল্পটা একদিন লিখব।'

নীলাঞ্জনা ঝলসে উঠেছিল, 'থাক্, তোমাকে আর আমার গল্প লিখতে হবে না। তোমার গল্পের নায়িকাদের মত অসভ্য না কি আমি ?'

হয়তো নীলাঞ্জনা যখন ওই কথাটা বলেছিল, তখন দক্ষিণের দেয়ালে টিকটিকি ডেকে উঠেছিল, হয়তো বা নীলাঞ্জনার বিধাতা হেসে উঠেছিলেন।

বিম্বিসার বলেছিল, 'আমার নায়িকারা বুঝি সকলেই অসভ্য ?'

নীলাঞ্জনা ফের ঝলসে উঠেছিল, 'না তো কি ? তোমার নিন্দেয় তো কান পাতা যায় না।'

কথাটা হয়তো খুব মিথ্যে ছিল না তখন। প্রথম কলম ধরেই বেশ কিছু নিন্দে কুড়িয়ে ছিলেন বিম্বিসার, নির্লজ্জতার প্রশ্নে, শালীনতার প্রশ্নে।

বিম্বিসারের বাবা বলেছিলেন, 'এর থেকে তোমাকে যদি অক্ষর-

পরিচয়হীন গণ্ডমুখ্যু করে রেখে দিতাম, সমাজে অনেক 'মুখ' থাকতো আমার।'

অতি শৈশবে মা মারা গিয়েছিলেন বিম্বিসারের, তাই মা যা বলতে পারতেন তা আর শুনতে হয় নি তাঁকে।

কিন্তু বাপের মুখ রাখবার জন্যে কি কলমের মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে ছিলেন বিম্বিসার ?

তাই আজ এই জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে উঠেছেন ?

না, কলমের মোড় ঘোরাতে হয় নি বিম্বিসারকে, কখন কোন ফাঁকে সমাজের মোড়ই ঘুরে গিয়েছিল। ভারী এক আশ্চর্য বস্তু এই সমাজ মন। অদ্ভুত ম্যাজিক জনতার মুখ।

ও যে কখন কাকে কোথায় বসায় !

আর কবি শিল্পী, নেতা অভিনেতা, এদের অদৃষ্টের সুতো তো ওই জনতারই মর্জির হাতে।

ওই মর্জি আজ যার মুখে কালি মাখায়, কাল তার ললাটে চন্দন তিলক আঁকে।

বিম্বিসারের ললাটেও এঁকেছে।

কিন্তু এ তিলক নীলাঞ্জনা দেখে যেতে পারে নি। তাই নীলাঞ্জনা বলেছিল, 'তোমার নায়িকাদের মত অসভ্য নই আমি !'…বলেছিল 'তোমার নিন্দেয় তো কান পাতা যায় না।'

সেদিন একথা বলতে পেরেছিল নীলাঞ্জনা। চকচকে চোখ আর ঝকঝকে মুখ নিয়ে। আর সেদিন যদিও বিম্বিসার নামক সেই দুঃসাহসী যুবা লেখক বলেছিল 'তোমার গল্পটা লিখব।' তবু সে জানতো নীলাঞ্জনাকে নিয়ে লেখার কিছু নেই। বড় বেশী সাধারণ মেয়ে নীলাঞ্জনা।

তখন তো তাই মনে হয়েছিল।

তারপর মোড় ঘুরে গেল।

তখন নীলাঞ্জনাকে নিয়ে গল্প লেখার কথা ভেবেছিল সেই উদীয়মান লেখক।

কিন্তু নীলাঞ্জনা কি বিম্বিসারের প্রথম প্রেম? তাই নীলাঞ্জনার গল্পটা আজো লেখা হয় নি?

না, না! নীলাঞ্জনা সুমিত্রর বৌ।

বিম্বিসারের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু সুমিত্র মিত্রের। বয়সের হিসেব না মেনে পরস্পর পরস্পরকে 'তুমি' বলবে এই শর্ত করেছিল ওরা। নীলাঞ্জনা আর বিম্বিসার।

বলেছিল 'আপনি'র ধার ধারব না।

আর সুমিত্র বলতো, 'বুঝলে নীলা, শাস্ত্রে আছে স্ত্রী আর সোনা এই দুটি জিনিসের ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস কোরোনা। একান্ত বন্ধুকেও না।…কিন্তু জগতে এই একটিমাত্র ব্যক্তি আছে, আমার এই একমাত্র বন্ধু, যার সম্পর্কে শাস্ত্রবাক্য শিথিল করা চলে। ওর কাছে তোমাকে গচ্ছিত রেখে আমি পৃথিবীর ওপিঠ অবধি ঘুরে আসতে পারি।'

নীলা বলতো, 'তা তোমার শ্রীযুক্ত বন্ধু মহোদয়টি না হয় জগতের অগাধ বিস্ময়, কিন্তু আমি? আমার সম্পর্কে কোন সন্দেহ না করার হেতু কি?'

সুমিত্র হেসে উঠতো।

বলতো 'তোমায় সন্দেহ করছি না এ কথা কখন বললাম? তোমাকে আমি অবশ্যই শিশিরের কাছে কিম্বা বিজু ব্যানার্জির কাছে গচ্ছিত রেখে পৃথিবীর ওপিঠে ঘুরতে যাব না। দরজার পর্দার ওপিঠে যেতেই দ্বিধা করবো।'

'অসভ্য! ছোটলোক! ইতর! বিশ্রী!'

নীলা রেগে উঠে যা তা বলতো। আর সুমিত্র হাসতো। বলতো 'দেখ বিম্ব দেখ। বিশ্বাস করলেও ওঁর মানের হানি, অবিশ্বাস করলেও অপমান।'

নিতান্তই কথার জন্যে কথা এ সব।

হালকা—আর অকারণ।

কারণ তখন সুমিত্র আর নীলাঞ্জনার জীবনও অকারণ আনন্দে পালকের মত হাল্‌কা ছিল।

কিন্তু সে কখন?

সে কি আজকের কথা?

তখন বিম্বিসার রায়ের তিনখানা মাত্র বই ছাপা হয়েছিল। গল্পের বই।

আর সেই তার পরে, কতদিন যেন পরে বিম্বিসার নীলাঞ্জনার কাছ থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বলেছিল, 'নীলাঞ্জনা তোমার গল্পটা লিখব আমি?'

অথচ লেখা হয়নি।

তারপর তিয়াত্তরখানা বই ছাপা হয়ে গেলেও না। কিন্তু কেন হল না? নীলাঞ্জনা তো উপাদান দিয়ে গিয়েছিল। এ কি শুধু বিম্বিসারের আলস্য? না কি তারপর থেকে 'জনপ্রিয়' হয়ে উঠেছিলেন বিম্বিসার, তাই!

নিজের লেখা লেখার আর সময় পান নি এতখানি বয়সে।

আজ লিখবেন।

লেখার সরঞ্জাম নিয়ে বসেই প্রথম লিখলেন, 'আজ কিছু লিখবই,

আজ কিছু লিখতেই হবে।'...নীলাঞ্জনা আজ কি তোমার গল্পটা লিখব ?...সেই যেদিন তুমি—

লেখা হল না।

দেবী আশ্রমের সেক্রেটারী অনুভা দেবী এসে হাজির হলেন। আশ্রমের জন্য বরাদ্দ মাসিক চাঁদাটা নিতে এসেছেন অনুভা দেবী।

যদিও চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়ানো কাজটা তাঁর নয়। তথাপি এখানে তিনিই আসেন। কারণ বিম্বিসার রায়কে, অথবা তাঁর কলমকে সুপথে চলবার নির্দেশ দেওয়াটা অনুভা দেবী নিজ দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

'নতুন কি বই বেরুল', তিনি প্রশ্ন করেন। আশ্রমের লাইব্রেরীর জন্য সেই নবতমকে দাবী করেন, এবং তারপরই তীব্র অভিযোগ সুরু করেন 'কী লিখছেন বলুন তো আপনারা লেখকরা আজকাল ? আশ্রমের মেয়েদের হাতে তুলে দিতে দশবার ভাবতে হয়। লাইব্রেরীর একটা আলমারির চাবি তো সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে রেখেছি। মানে নতুন নভেল এলে আগে নিজে পড়ে দেখে তবে তো লাইব্রেরীতে জমা দিই।'

বিম্বিসার একদিন বলেছিলেন, 'আপনার আশ্রমের মেয়েদের জন্যে বরং লাইব্রেরীতে অন্য ধরনের বইটই রাখলে ভাল হয়।'

অনুভা দেবী স্থির গম্ভীর প্রশ্ন করেছিলেন, 'অন্য ধরনের বই বলতে কী বোঝাতে চাইছেন ? ধর্মপুস্তক ?'

'আহা না না, নিছক ধর্মপুস্তক বলছি না, তার জন্যে তো আপনাদের ধর্মের ক্লাশই রয়েছে, তার থেকে পাচ্ছে সেটা। আমি বলছিলাম—জীবনী ভ্রমণ কাহিনী নানা জাতের প্রবন্ধ এই ধরনের আর কি !'

'এই ধরনের? তার মানে আপনি বলতে চাইছেন কোনো পত্রিকা রাখব না আশ্রমে? কোনো খবরের কাগজ?'

'না না সে কি—'

'তবে? পত্রিকাতেই তো আপনাদের সব কিছু আগে ছাপা হচ্ছে। ছাপা হচ্ছে খবরের কাগজে। সব কিছু বন্ধ করে দিয়ে মেয়েদের চিন্তার জগৎকে তো দেউলে করে রাখতে পারি নে।'

বিম্বিসার ভাবেন, 'তা হয়তো না পারাই উচিত। কিন্তু বাংলা দেশে লেখক কি একমাত্র বিম্বিসার রায়ই আছেন?

না কি 'দেবী আশ্রমের' পাড়ায় থাকার অপরাধেই বিম্বিসারের এই শাস্তি? অনুভা দেবী তো লেখকদের সুপথে আনতে কাগজে লেখালিখি করতে পারেন!

আজ ঠিক এই লেখার মুখে অনুভা দেবীকে দেখে, বলাই বাহুল্য, খুব একটা প্রীত হলেন না বিম্বিসার। তাড়াতাড়ি ওঠাবার জন্যে ওঁকে দেখা মাত্রই ড্রয়ার খুলে টাকা বার করলেন।

কিন্তু অনুভা দেবী কি এ ইসারা গ্রাহ্য করলেন?

না!

অনুভা দেবী সে ধাতুতে গড়া নয়।

উনি যা সংকল্প করেন, তা করেনই। উনি আজ বসবার সংকল্প নিয়ে এসেছেন। মহিলাবিহীন বাড়ি বলে কুণ্ঠিত হবেন, সে স্টেজ আর এখন নেই অনুভা দেবীর। কোনো প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে অবশ্য থাকেও না। কারুরই না।

দেড় ইঞ্চি চওড়া পাড়ের একখানি সাদা খদ্দর শাড়ি, আর প্লেন সাদা ব্লাউস, এইমাত্র পরিধানে অনুভা দেবী আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে বেড়ান। এবং ঠিক কোনখানটিতে আবেদনের হাতটি বাড়িয়ে দিলে সাহায্যের হাতটি বেরিয়ে আসবে, এ অনুভা দেবীর নখদর্পণে।

এই করে করে তিনি আশ্রমের 'নিজ বাটির' জন্যে কর্পোরেশন থেকে জমি, আর সরকারের কাছ থেকে বাড়ি তোলার আধা খরচ আদায় করে ছেড়েছেন।

বিম্বিসার মনে মনে অনুভা দেবীর এই কর্মক্ষমতাকে 'ধন্য ধন্য' করেন, কিন্তু এঁর বাচন ক্ষমতাকে বড় ভয় করেন। আজও তাই 'দেবী' বসলেন দেখে হতাশ হয়ে কলম রাখলেন।

অনুভা দেবী এ ভঙ্গীতে দৃকপাত মাত্র না করে প্রথমেই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেন, 'কি লিখছেন ? ঐতিহাসিক উপন্যাস ?'

বিম্বিসার মৃদু হেসে বলেন, 'নাঃ! ঐতিহাসিক উপন্যাস আমি তো কখনো লিখি নি।'

'কেন লেখেন নি ?'

অনুভা দেবী টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েন। অনুভা দেবীর উত্তপ্ত নিশ্বাস হাতে এসে লাগতে পারে ভেবে ভয়ে হাতটা সরিয়ে নেন বিম্বিসার।

উনি বলেন, 'কেন লেখেন না ? না লেখবার কারণ ? ওতে তো অনেক পয়সা হয় ?'

এ প্রশ্নের উত্তর নেই। দিতে ইচ্ছেও হয় না, তত্রাচ উত্তর দেন বিম্বিসার। হয়তো প্রশ্নকারী মহিলা বলেই দেন।

'পয়সার জন্যেই কি সব ?'

অনুভা দেবী হেসে ওঠেন, 'নতুন কথা শোনালেন বটে। আমি তো এ যাবৎ দেখে আসছি জগতে ওটাই সব। ওই ঐতিহাসিক ঘটনা আর ঐতিহাসিক চরিত্র, এতো আপনাদের লেখকদের কাছে বেওয়ারিশ স্বর্ণখনি। আছে পড়ে একখানে, অথচ ওয়ারিশ নেই কেউ। সবাই একবার করে খুঁড়ছেন, আর চোরের মার মারছেন। পাক দিয়ে সুতো লম্বা করে আধমণ ওজনের এক এক খানি বই বানিয়ে ইহকালটা গুছিয়ে নিচ্ছেন। কবরের কঙ্কাল তো কথা বলেনা ? তাই তাদের দিয়ে যা খুসি তাই করাচ্ছেন, যা নয় তাই

বলাচ্ছেন, উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। ইতিহাসকে এই-ভাবে বিকৃত করবার কী অধিকার আছে আপনাদের ?'

অনুভা দেবীকে বেশ উত্তেজিত দেখায়।

বিম্বিসার অবশ্য বিশেষ আশ্চর্য হল না।

কারণ অনুভা দেবীর এ মূর্তি তাঁর পরিচিত। তবে ঈশ্বর জানেন কেন 'দেবী আশ্রমের' অনুভা দেবী, বেচারা বিম্বিসার রায়কে সমস্ত বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি খাড়া করে শূলে চড়াতে আসেন।

আর কেনই বা প্রায়ই এই তুচ্ছ কাজে তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে যান।

প্রশ্নটার ঠিক উত্তর পান না।

পাড়ার মিসেস দস্তিদারকে বোঝেন বিম্বিসার, বুঝতে দ্বিধা হয় না, কিন্তু অনুভা দেবী দুর্বোধ্য।

অনুভা দেবীর পরণের দেড় ইঞ্চি পাড় মোটা শাড়ি, ঘাড়ে ময়লা ধরা মোটা আর বেঢপ ব্লাউস, ঘাম ঘাম আর রাগ রাগ মুখ, টান করে বাঁধা খোঁপা এবং আধছেঁড়া পুরুষালি স্যাণ্ডেল, সব উত্তরকে বোবা করে দেয়।

বাতিকগ্রস্ত ছাড়া আর কি বলা যায় ?

কিন্তু…নীলাঞ্জনা যে অভিমান করে চলে যেতে চাইছে। বিম্বিসার তবুও বসে বসে অনুভা দেবীর সঙ্গে ভদ্রতা চালাবেন ?

বিম্বিসার ওয়ার্নিং দেন। চাঁদার টাকাটা ঈষৎ ঠেলে অনুভা দেবীর হাতের কাছাকাছি পৌঁছে দেন !…গলাটা একটু ঝাড়েন চেয়ার থেকে ওঠার পূর্ব মুহূর্তের একটা ভঙ্গী করেন।

কিন্তু অনুভা দেবী কি এ সব গায়ে মাখেন ?

মাখেন না।

বরং আরো তীব্র স্বরে বলেন, 'কেন, এই বর্তমানকে ফিল্ করতে

পারেন না আপনারা? কেন অনুভব করতে পারেন না সমাজ দিন দিন কী অধঃপাতে যাচ্ছে, মানুষ দিনের দিন কী ছোট, কী নীচ, কী কুশ্রী হয়ে যাচ্ছে। লিখতে পারেন না সে সব কড়া চাবুকের কলম নিয়ে? আঁকতে পারেন না আজকের যথার্থ সমাজচিত্র? বসে বসে শুধু প্রেমের গল্প—'

বিম্বিসার এবার একটু গম্ভীর হন।

বিম্বিসার যেন দূর অতীতের একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পান।......

'মানুষ ছোট, মানুষ নীচ, মানুষ নোংরা কুৎসিত দুর্বল এই শুধু দেখতে পাও তুমি বিম্ব? মানুষ মহৎ, মানুষ সুন্দর, মানুষ পবিত্র, এ তোমার কোথাও চোখে পড়ে না?'

সেদিন বিম্বিসার এই ভাবাবেগ দেখে হেসে উঠেছিলেন, আজ কিন্তু গম্ভীর হলেন। বললেন, 'মানুষ যে দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে নীচ হয়ে যাচ্ছে, নোংরা কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে, সমাজ অধঃপাতে যাচ্ছে এ আমি মানিনা অনুভা দেবী!

'মানেন না!'

অনুভা দেবী যেন হঠাৎ একটা নির্বুদ্ধিতার স্তূপকে দেখে ফেলেছেন। তাই অবাক দৃষ্টি মেলে বলেন, 'মানেন না, সমাজ দিন দিন—'

'না সত্যিই মানি না। বিশ্বাস করি না মানুষ প্রতিনিয়ত ছোট হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস আপনি সহ্য করতে পারেন না মনে হচ্ছে, কিন্তু যদি কোনদিন ধৈর্য ধরে 'মানুষের ইতিহাসে'র পাতা ওল্টান, দেখবেন সে ইতিহাস অধঃপতনের ইতিহাস নয়। উত্তরণের ইতিহাস।'

'ওই আনন্দেই থাকুন'—বলে তিক্ত একটু হেসে হাতের খদ্দরের বটুয়াটা টেবিলের উপর আছড়ে ফেলেন অনুভা দেবী।

বিম্বিসার চুপ করে যেতে পারতেন। বিম্বিসার অনুভা দেবীর

এই তাল ঠুকে সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা দেখে হাসতে পারতেন, বিম্বিসার মহিলাটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারতেন, কিন্তু কেন তা করলেন না আজ। রোজ তো তাই করেন। আজ বিম্বিসার যুক্তি-তর্কের পথ ধরতে গেলেন। বললেন, 'কেনই বা সেই আনন্দে থাকব না বলুন? সে আনন্দ যে রয়েছে!…

'রয়েছে'?…

'নিশ্চয়! আচ্ছা একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপারে চলে আসুন না। নজীর হিসাবেই বলছি, কিছু মনে করবেন না। এই যে আপনি—শুনতে পাই অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, দেখতেও সুন্দরী, ইচ্ছে করলেই একটি 'কেষ্ট বিষ্টু' স্বামীর গলায় মালা দিয়ে সারাটা জীবন খেয়ে শুয়ে গাড়ি চড়ে আর গহনা গায়ে চড়িয়ে আরামে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে আপনি কেন খামোকা চিরকুমারী থেকে, চটের শাড়ি পরে আর ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে করে অপরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? কেন কতকগুলো আশ্রয়হীন মেয়েকে কাছে টেনে, তাদের আশ্রয় দিচ্ছেন, আহার দিচ্ছেন, দিচ্ছেন শিক্ষা দীক্ষা ভালবাসা?'

বিম্বিসারের কথা শুনতে শুনতে মুহূর্তে, মুহূর্তে মুখের রং বদলাচ্ছিল অনুভা দেবীর। কখনো আরক্তিম, কখনো ধূসর, উজ্জ্বল হয়ে উঠল পরিসমাপ্তিতে।

হাতের বটুয়াটা লুফতে লুফতে মৃদু মধুর হাসির সঙ্গে লজ্জার সুর মিশিয়ে বললেন, 'আপনি আবার বড্ড বেশী বাড়াচ্ছেন! অত কিছু না! তবে এটা করতে ভাল লাগে।'

'সেই কথাই বলছি অনুভা দেবী। মানুষের বাইরের চেহারা হয়তো নানা পারিপার্শ্বিকতায় ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু সেটাই মানুষের সব নয়। যা ভাল, যা মহৎ, যা সুন্দর, তা তার ভাল লাগে।'

'তবু দেখুন—' অনুভা দেবী আবার কথা তোলেন—বিম্বিসার

মনে মনে বলেন হল না নীলাঞ্জনা, তোমার গল্পটা আজও লেখা হল না।

হল না।

কারণ অনুভা দেবী আবার বলতে সুরু করেছেন, 'কিন্তু দেখুন সামগ্রিকতাটাই তো ধারণা করবেন আপনি? সমষ্টি নিয়েই বিচার? সে হিসেব করে দেখুন? এই যে আপনার পাশের প্রতিবেশিনী মিসেস দস্তিদার, ওঁর সাজানো গোছানো ড্রইংরুমটিই দেখতে পান আপনারা, কিন্তু ওঁর ভিতরের জীবন জানেন? আগে উনি—'

বিম্বিসারের মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে।

বিম্বিসার সহসা গম্ভীর আর রুক্ষ গলায় বলে ওঠেন, 'মাপ করবেন অনুভা দেবী, কোনো মহিলার ভিতরের জীবন সম্পর্কে কোনো কৌতূহল আমার নেই, জানবার দরকারও দেখি না।'

অনুভা দেবীও কঠিন হন, গম্ভীর হন। আহত গলায় বলেন, 'ডাক্তার উকিল আর লেখকদের এত সুকুমার হলে চলে না বুঝলেন? তাদের অনেক বাস্তব বস্তু শুনতে হয়, অনেক বুঝতে হয়। যাক আপনার অমূল্য সময়ের অনেকটা নষ্ট করে গেলাম। নমস্কার!'

বিম্বিসারও নমস্কার করেন।

ডাক্তার উকিল আর লেখক এক পর্যায়ে পড়ে কি না সে নিয়ে তর্ক তোলেন না। হাত তুলে প্রতি নমস্কার করেন।

অনুভা দেবীর চেহারাটা দরজার পৃষ্ঠপটে মিলিয়ে যায়।

বিম্বিসার দেখেন অনুভা দেবীর পিঠের আঁচলটার খানিকটা ছেঁড়া, দেখেন অনুভা দেবীর চটির স্ট্র্যাপটার একদিকে খসে গিয়ে গোড়ালীর গোড়ায় লটপট করতে করতে চলেছে।

বিম্বিসার রায় ঈষৎ লজ্জিত হলেন।

ভাবলেন ওই রূঢ়তাটুকু না দেখালেই ভাল হতো। এঁরা, এই

সমাজসেবিকারা আর দেশহিতৈষীরা অন্য এক ভাবজগতের লোক, ওরা কেবলমাত্র ওদের আদর্শের চোখ দিয়েই জগতকে দেখে। তাই শোভন অশোভন জ্ঞানটা ওদের, আমাদের সঙ্গে হয়তো ঠিক মেলে না।

হাসলেনও একটু।

মহিলাটি বোধহয় চান জগতের তাবৎ মহিলাকুল একযোগে 'দেবী' হয়ে উঠুক। ইঞ্চিপাড় চটের শাড়ি গায়ে জড়িয়ে, আর কতকগুলো শাকপাতা দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে ত্যাগের প্রতিমূর্তি হয়ে ঘুরে বেড়াক সবাই, ওঁর দেবী আশ্রমের বাইরেও কৃচ্ছ্র সাধনের আদর্শ কণায় কণায় বাড়ুক।...

তাই মিসেস দস্তিদারদের দেখলে অনুভা দেবীরা জ্বলে ওঠেন। কিন্তু বিম্বিসার তা ওঠেন না।

বিম্বিসার মিসেস দস্তিদারকে বুঝতে পারেন। বিম্বিসার মিসেস দস্তিদারকে দেখে ক্রুদ্ধ হন না, কৌতুক অনুভব করেন মাত্র।

কলমটা আবার তুলে নিলেন বিম্বিসার। মনে মনে বললেন নীলাঞ্জনা তোমার গল্পটা না লিখে মরে গেলে ঋণী হয়ে মরতে হবে আমায়।...

কিন্তু কোনখান থেকে আরম্ভ করবো বল তো? সেই তোমার ছেলেবেলা থেকে? না কি যখন তুমি বাল্যের অজ্ঞাত অন্তরাল থেকে সহসা নবকৈশোরের দীপ্তি নিয়ে উথলে উঠলে, আর উথলে তুললে আমার বন্ধু সুমিত্রকে।

আমার সব চেয়ে বন্ধু।

যে বন্ধু মরতে বললে মরতে পারতাম আমি।

না কি আরো এগিয়ে যাব নীলাঞ্জনা? যেখানে তুমি তোমার সেই শাদা রেশমী মনটা নিয়ে একেবারে নিজের বুদ্ধিমত একটা

বিচার নিয়ে কাজ করতে বসে শুধু ধূলোর নৈবেদ্য পেলে। তোমার কোন্ মূর্তিটা নিয়ে সুরু করবো ?

কিন্তু তোমার যে মূর্তিই আঁকি, তোমার যেখান থেকেই লিখি, একথা আমার না লিখে উপায় নেই নীলাঞ্জনা, ভুল তুমি করেছিলে। ভুল না করলে সেদিন অমন নীল হয়ে গিয়ে বোকার মত নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকতে হত না তোমায়। ভুল করেছিলে তুমি।

কিন্তু বুঝতে পারছি না কোন্খানটায় ঘটেছিল সেই ভুলটা।

তোমাদের সেই অতি রক্ষণশীল শান্তছন্দ ব্রাহ্মণ পরিবারে, অব্রাহ্মণ একটা ছেলের প্রেমে পড়ে আর বিয়ের জন্যে জেদ করে, যে ঝড় তুলেছিলে তুমি, সেটাই কি তোমার প্রধান ভুল ? না কি সুমিত্র মিত্রের অবাস্তব দেশসেবার গোঁয়াতুর্মিতে ঝাঁপিয়ে পড়াটা ?

অথবা তোমার নিজের ধরনে ভেবে যে অদ্ভুত কাজটা করে বসে ধূলোর নৈবেদ্য কুড়িয়েছিলে, সেই ভাবনাটাই তোমার ভুলের প্রধান নিদর্শন ?

তবে একথা তুমি বলেছিলে বটে। সেই যেদিন বলেছিলে, 'আমার মনে হয় বিম্ব, আমার বাবার অভিশাপ লেগেছিল আমার জীবনে।'

আমি ব্যথিত হয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, 'ওকথা বলতে নেই নীলাঞ্জনা। তোমার বাবাকে আমি দেখেছি। কাউকে অভিশাপ দেবার মত মানুষ তিনি নন। তা ছাড়া—মা বাপ কি কখনো সন্তানকে অভিশাপ দিতে পারে ?…রাগ করতে পারে তিরস্কার করতে পারে হয়তো তেমন কিছু ঘটলে সম্পর্কও ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু অভিশাপ ? না না নীলাঞ্জনা, এই অমানবিক চিন্তাটা তুমি কোরো না।'

নীলাঞ্জনা, তুমি মৃদু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিলে, 'ইচ্ছে করে

অভিশাপ না দিন, তাঁদের মনস্তাপটাই বোধহয় অভিশাপের শক্তি নিয়ে অবাধ্য উদ্ধত সন্তানের জীবনকে বিধ্বস্ত করে দেয়।'

আমি মমতার বশে বলতে পারি নি, 'জীবনটাকে যদি কেউ নিজের হাতে বিধ্বস্ত করে বসে, কার কি দোষ?

না, সে কথা বলি নি।

শুধু বলেছিলাম, 'নীলাঞ্জনা জীবনেরও পুনর্বাসন হতে পারে না কি? সুমিত্র তো—'

তুমি আরক্ত হয়ে বলে উঠেছিলে, 'ছি, বিম্ব, ছি!'

ওই 'ছিঃ-টাই তোমার সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল কি না, তাই বা কে বলতে পারে। নিজের মনকেই কি চেনা যায় সবসময়?'

'জীবনের পুনর্বাসন' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল সুমিত্রই।

সুমিত্র মিত্র।

বিম্বিসারের আবাল্যের বন্ধু।

নীলাঞ্জনার সঙ্গে প্রথম ভালবাসার সময় সুমিত্র যখন একদিন তার সঙ্গে বিম্বিসারের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'এই দেখ, আমার সেই শিশু ভোলানাথের আমলের বন্ধু।'

নীলাঞ্জনার নীলাভ আলো আলো চোখটা কৌতুকে ঝলসে উঠেছিল, 'ও! সেই যিনি তোমার জন্যে মরতে পারেন, বাঁচতে পারেন, জলে পড়তে পারেন, আগুনে পুড়তে পারেন?'

বিম্বিসারও সকৌতুকে হেসে উঠেছিল, 'থামলেন কেন? থামলেন কেন? চালিয়ে যান—বিষের বোতল গলায় ঢালতে পারেন, রেল-লাইনে বুক পাততে পারেন...উঃ সুমিত্র, কত গুল মেরে রেখেছিস?'

'গুল মানে? খাঁটি সত্য।' সুমিত্র হেসে উঠেছিল। হ্যাঁ এখন সমস্তটা চোখের উপর দেখতে পাচ্ছেন বিম্বিসার।

সুমিত্র হেসে উঠে বলল, 'তোদের সেই রাজসাহীর বাড়িতে যেবার গিয়েছিলাম, সেই কুকুরের কথা আর পুকুরের কথা ভাব।'

'কুকুর, আর পুকুর?'

নীলাঞ্জনা উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠেছিল। এটা কি কোনো কবিতার মিল না কি? ছন্দময় কবিতার?'

'হ্যাঁ তাই।' সুমিত্র বলেছিল, 'ছন্দময় জীবন কবিতার দুটি সহজ মিল।...আমি কলকাতার ছেলে, শখ করে গেলাম পুকুরে নাইতে। ব্যস দিব্যি পা হড়কে তলিয়ে গেলাম।...অতঃপর এই বিম্ববাবুর রক্ষাকর্তার ভূমিকা।'

নীলাঞ্জনা কৌতুক করে বলেছিল, 'আহা! এতে আবার বাহাদুরির কী আছে? তুমি যখন ওঁদের বাড়ির গেস্ট, ওঁদের পুকুরে অপঘাত ঘটলে, শুধু বিবেকের দংশনই নয়, হয়তো পুলিশেরও দংশন হতে পারতো। সেই ভয়েই—'

'বলুন তো, বলুন তো।' বিম্বিসার বলে ওঠে, 'আশা হচ্ছে হতভাগাটার জ্ঞানদৃষ্টি উন্মোচিত করতে সক্ষম হবেন আপনি। এমন বোকা আর ভাবুক।'

'অথচ সেটা আপনারই হওয়া উচিত ছিল,' নীলাঞ্জনা বলেছিল, 'আপনি তো শুনেছি লেখক।'

না, তখন অবিশ্যি ওর বেশী পাওনা হবার কথা নয় বিম্বিসারের। তখন মাত্র বিম্বিসারের দ্বিতীয় বই প্রেসে উঠেছে।

তবু 'আপনি তো শুনেছি লেখক' এই পরিচয়টুকু খুব একটা উদ্দীপিত করল না বিম্বিসারকে।

বিম্বিসার বলল, 'আপনিও যেমন! বিশ্বাস করেছেন সেই কথা? ওটাও সুমিত্রর আর এক গুল!'

'বাঃ সে কি? লেখক বিম্বিসার রায় আপনিই নয়?'

'ছেড়ে দিন। আরশোলা যেমন পাখি, আমিও তেমনি লেখক। পড়েছেন কদাপি বিম্বিসার রায়ের লেখা ?'

নীলাঞ্জনা চোখ তুলে তাকিয়ে একটু লজ্জার হাসি হেসেছিল। তারপর বলেছিল, 'আমাদের বাড়িতে এসব নিয়ে বড় কড়া শাসন। আমার কাকা আধুনিক লেখকদের লেখা একেবারে বাড়িতে ঢুকতে দেন না।'

শুনে বিম্বিসারের ভারী হাসি পেয়ে গেল।

ওই হেন কড়া বাড়ির মেয়ে হয়েও তো দিব্যি একখানি প্রেম করছ বাবা। হেসেই ফেলল।

'হাসলেন যে ?'

'ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব ?'

'নির্ভয়ে, নির্ভয়ে !'

'বলছি সেই কড়া বাড়ির বেড়া ডিঙিয়ে প্রেমের মাঠে চরতে এলেন কি করে ?'

নীলাঞ্জনার নীলচে চোখটা ধূসর দেখাল।

'আর বলবেন না। যা করে চালাচ্ছি। মিথ্যা জাল রচনা করে করে—'

সুমিত্র তখন বলে উঠল, 'সেই তো হয়েছে মুস্কিল, ভীষণ গোঁড়া বাড়ি! কি করে যে ওই বাড়িতে এই মেয়ে! একেবারে দৈত্যি-কুলে পেল্লাদ! মনে হচ্ছে বেশ একটি সংঘর্ষ আসন্ন।'

নীলাঞ্জনা কাঁদো কাঁদো মুখে বলেছিল, 'ওসব কথা আর এখন মনে করিয়ে দিও না সুমিত্র, ভাবলেই হৃৎকম্প হয় আমার। তার চাইতে যে গল্পটা হচ্ছিল, সেটাই হোক—'

'গল্পটা ?'

'বাঃ ওই যে পুকুর আর কুকুর ? কুকুরটা তো শোনা হল না ?'

'ও হো হো হো!' দুই বন্ধু হেসে উঠেছিল। 'সে এক নাট্য মুহূর্ত! শীত শীত হাওয়ায় দিব্যি চাঁদের আলোয় সান্ধ্যভ্রমণ সেরে ফিরছি মাণিকজোড়, হঠাৎ দেখি তেমনি জোড়ামাণিক দুটি বাঘা বাঘা কুকুর তেড়ে আসছে আমাদেরই লক্ষ্য করে।...ধারে একটা গাছ পর্যন্ত নেই যে, উঠে পড়বো, একখানা কারো বাড়ি নেই যে, ঢুকে পড়বো, মনে হল আর কিছু নয় স্বয়ং যমরাজই দুজনের জন্যে দুটি দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন।'...সুমিত্রই কথা শেষ করেছিল, ঠিক যে কি হল তারপর সেটা বলতে পারব না, তবে চৈতন্য ফিরলে দেখলাম কুকুর দুটো সহসা স্থির হয়ে গিয়ে বিম্বর গায়ের র‍্যাপারটা আর পায়ের জুতো জোড়া ভক্ষণ করতে লেগেছে, বিম্ব সোজা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে।

'অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব?' নীলাঞ্জনা বলে উঠেছিল, 'ঝপ্ করে ওদের সামনে খাদ্য ছুঁড়ে দিয়ে থামানো আর কি!'

সুমিত্র রাগের ভান করে বলেছিল, 'তুমি কিছুতেই আমার বন্ধুর মহিমা দেখতে পাচ্ছো না কেন বল তো?'

'বাঃ বন্ধু যে! বন্ধুর জন্যে বন্ধু এটুকু করবে না?' বলেছিল সেদিন নীলাঞ্জনা।

অনেক দিন পরে আরো একবার বলেছিল ওকথা। বলেছিল 'আমি তো তোমার বন্ধু বিম্ব, আমার জন্যে এটুকু করবে না?'

কিন্তু সে অনুরোধ রাখা সম্ভব হয় নি বিম্বিসারের পক্ষে।

সে কি রাখার মত অনুরোধ?

নীলাঞ্জনা বলেছিল, 'তুমি কেমিস্ট্রির প্রফেসর বলেই বলছি বিম্ব, ওটা তোমার পক্ষে জোগাড় করা সহজ।'

হ্যাঁ জোগাড় করা হয়তো সহজ ছিল, কিন্তু জোগান দেওয়া কি সহজ?

হাসপাতালে বলেছিল নীলাঞ্জনা, 'এমন করে পুড়ে বিশ্রী দেখতে হয়ে মরার ইচ্ছে আমার ছিল না বিম্ব, কিন্তু তুমি তো দিলে না জোগাড় করে সহজে ঘুমিয়ে পড়ার মত মরবার ওযুধ।'

অথচ যখন নীলাঞ্জনাদের বাড়িতে ঝড় চলছিল, আর নীলাঞ্জনা সেই ঝড়ের মুখে অটল থেকে লড়েছিল, তখন কে ভেবেছিল এই পরিণতি হবে নীলাঞ্জনার!

বিম্বিসার একদিন গিয়েছিল নীলাঞ্জনাদের বাড়িতে সুমিত্রর তরফ হয়ে, সুমিত্রর অনুরোধ নিয়ে তাঁদের বোঝাতে, অনুরোধ করতে। নীলাঞ্জনার বাবা বলেছিলেন, 'আর বোঝাবার কিছু নেই। আমি তো ধরেই নিয়েছি আমার একটা মেয়ে মরে গেছে।'

বিম্বিসার এই একটা কৃত্রিম অহমিকার বিরুদ্ধে তর্ক তুলতে গিয়েছিল, ভদ্রলোক শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'তোমাদের এ যুগের সমস্ত যুক্তি আর তর্ক আমি জানি বাবা, হয়তো মানিও, কিন্তু নিজের মনকে মানানোর ক্ষমতা নেই। যে ছেলের গলায় যজ্ঞসূত্র নেই, তার হাতে কন্যা সম্প্রদান করছি এ আমি ভাবতেই পারছি না।'

'কিন্তু মেয়েকে আপনি—' বলেছিল বিম্বিসার 'কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিলেন—'

নীলাঞ্জনার বাবার চোখটা জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু—না, একথা বলে ওঠেন নি তিনি, 'কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিলাম, প্রেমে পড়তে পাঠাই নি।'

সেকথা বলেন নি। শুধু বলেছিলেন, 'আমার বংশের রক্তধারার ওপর বড় বেশী আস্থা রেখেছিলাম আমি, সেই ভুল অহঙ্কারে আমার একটা সন্তানকে হারালাম! আমার সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকে।'

তর্কের আরও অনেক পথ ছিল, কিন্তু আর তর্ক করেনি বিম্বিসার।

মাথা নীচু করে চলে এসেছিল। আর হঠাৎ সেদিন সুমিত্রর ওপর ভারী রাগ হয়েছিল তার। মনে হয়েছিল খুব একটা গর্হিত কাজ করেছে সুমিত্র।

কিন্তু এক সুমিত্রই কি অপরাধী?

'ও যে পাগল একেবারে!'—বলেছিল সুমিত্র, 'আমি তো ঠিক করেছিলাম জীবনকে আর এই গতানুগতিকতার পথে জড়াব না। বাবা ঠাকুর্দা যে টাকার পর্বত রেখে গেছেন, দেশের কাজের ছুতো করে সেইগুলো ওড়াব বসে বসে। আর শেষ জীবনের জন্যে মোটা কিছু টাকা কোনো মিশনে জমা দিয়ে রেখে দেব, যাতে নিশ্চিন্তে শুয়ে বসে কাটাতে পারি তখন।···কিন্তু মেয়েটা যে আমাকে না পেলে মরবে বলে শাসিয়েছে!'

শাসিয়েছে!

'তা'হলে শাসানির ভয়েই বিয়ে করছিস?'

'প্রায় তাই!' হেসে উঠেছে সুমিত্র, অনেকটা হেসেছে। তারপর গম্ভীর হয়েছে, 'সত্যি আমার জীবনটার সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলে ভুলই করল বোধহয় ও। এর থেকে যদি তোর প্রেমে পড়তো বাবা!'

'বাঃ! চমৎকার!'

'খারাপ কি? তুই সৎ ব্রাহ্মণের ছেলেও ছিলি, ওদের বাড়িতে আপত্তি উঠত না। এবং—'

বিম্বিসার কথা শেষ করতে দেয়নি। হেসে উঠে বলেছিল, 'আমা হেন গুণনিধি যদি আগে চোখে পড়তো ওর, তা'হলে কি ওই ছাড়া আর কিছু হতো?'

'তাই মনে হচ্ছে ! যাই দেখি মাথায় এখন আবার এক বিয়ের দায়িত্ব চাপল !'

চিন্তার ভান দেখিয়েছিল সুমিত্র। ওই রকমই ছিল তখন সুমিত্র, হাসিখুসি খোলামেলা। সদাই উল্লসিত, সদাই কৌতুকে চঞ্চল। পরে বদলে গেল। পরে আর সেই সুমিত্র মনেই হতো না !

নীলাঞ্জনা যখন—চমকে উঠলেন বিম্বিসার রায় ! আবার আসছেন একজন !

অর্থাৎ নীলাঞ্জনার গল্প আজও আর হল না ! যিনি এলেন, তিনি একজন সি. আই. ডি. পুলিশের গোপন চক্রী। সাদাসিধে বেশবাস, কোথায় কোন্ চক্রে যে ওঁর কর্মক্ষেত্র, নিতান্ত নিকট-জনও জানতে পারে না। বিম্বিসারের ছোট ভাইয়ের একদার বন্ধু। স্কুলের কলেজের। ভাই নেই, তাই ভাইয়ের এই বন্ধুটির প্রতি কেমন যেন একটু স্নেহ-দুর্বলতা আছে বিম্বিসারের। বেশ সমারোহ সহকারেই অভ্যর্থনা করে বললেন, 'তারপর কী খবর ? উপলক্ষটা কী ?'

'উপলক্ষ ? উপলক্ষ আর কি ? এমনি—' বলল ছোকরা।

'এমনি !' বিম্বিসার হেসে ওঠেন, 'এটা তুমি বড্ড কাঁচা চালাকের মত কথা বললে প্রসাদ ! 'এমনি' তোমরা একটা নিশ্বাসও নাওনা, সে আর জানতে বাকী নেই।'

'নাঃ আপনি দেখছি······বাস্তবিক বিম্বদা, স্রেফ্ বেড়াতেই। মিথ্যে বলে তো লাভ নেই। আসল কথা আপনি লেখক, তাই জানি, কী লেখেন তা' জানি না। বৌ বড় লজ্জা দেয়। বলে ওনাদের মত লোকের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে লোকে মরে যায়, আর তোমার আছে আলাপ, তা' একটু ঝালাতে যাওনা ? তাই

একটু ঝালাতে এলাম।···মানে আর কি—'জ্বালাতেও' বলতে পারেন। বই দিতে হবে কিছু আপনার বৌমাকে।'

বই! বলাবাহুল্য খুব প্রীত হলেন না বিম্বিসার।

বই দিলেই হয়তো এখুনি একগাল হেসে বলবে, 'আপনার বৌমার নাম লিখে দিন!'

এতদিন পরে হঠাৎ তুচ্ছ উপলক্ষটায় কি বিম্বিসার এত ক্লান্ত হলেন যে, মনে মনে বলে উঠতে ইচ্ছে হল—নীলাঞ্জনা, সুমিত্র যা বলেছিল যদি তাই হতো! যদি আমার সঙ্গেই আগে দেখা হতো তোমার! তা' হলে আমি অনায়াসেই এদের সব তোমার কাছে ঠেলে দিয়ে আত্মরক্ষা করতাম!

বিম্বিসারের অন্য লেখক-বন্ধুরা তাঁদের গৃহিণীদের গুণপনার বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হন।

বলেন, 'আমি? আমি ভাই ইহসংসারের কিছু জানি না। যা করেন উনি। জীবনযাত্রার কোন্ উপকরণটা দুর্লভ হয়ে উঠেছে, আর কোন্‌টা বা দুর্মূল্য, সে উনিই বলতে পারেন। ছেলে মেয়ের লেখাপড়া, ডাক্তার, ওষুধ, আমি কিছুর মধ্যেই নেই।' 'উনি'র বর্ণনায় মাত্রা রাখতে ভোলেন তাঁরা!

'উনি' স্বামীকে ঘরে পুরে রেখে, 'বাড়ি নেই বেরিয়েছেন—' বলে লেখার ব্যাঘাতকারীকে ঠেকান, 'উনি' সুস্থ লেখককে 'ভীষণ অসুস্থ' বলে ফাংশানবাজদের ঠেকান, 'উনি' স্বামীর ক্লান্তি অপনোদন করাতে, নিজে বিরহযন্ত্রণা ভোগ করে স্বামীকে বছরে তিনবার চেঞ্জে পাঠান।···

আরো কত কিই যে করেন উনিরা!

বিম্বিসারের ঘরে এই ঐশ্বর্যটির অভাব। 'উনি'হীন সংসারে

বিম্বিসারের একটি চাকরই একমাত্র ভরসা! একটা ভাগ্নে থাকে, তা সে উপকারের চাইতে অপকারটাই বেশী করে।

কাজেই আত্মরক্ষার ঠাঁই নেই বিম্বিসারের। অথচ আশ্চর্য, ভারী সংসারী আর সামাজিক মন বিম্বিসার রায়ের।

নইলে একা মানুষ, কী দরকার ওঁর অতিথি এনে তার আপ্যায়ন করতে বসবার?

ভিতর দিকের ঘর থেকে দুটো বই নিয়ে এলেন বিম্বিসার, সঙ্গে সঙ্গে চায়ের অর্ডার দিয়ে এলেন চাকরকে।

অনেকদিন আগে মৃত ছোট ভাইয়ের বন্ধু, এমনি মুখে চলে যাবে? অথবা কি অনেকদিন আগের নীলাঞ্জনার কথাটাই মনে বাসা বেঁধে আছে বিম্বিসারের, নীলাঞ্জনা তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু সুমিত্রর বৌ ছিল বলে? তাই কেউ অমনি চলে গেলে তাঁর অস্বস্তি হয়? নীলাঞ্জনাই তো বলতো, 'যে কোনো সময় যে কেউ আসুক, এই যে কিছু খেতে দেবার প্রথা আছে আমাদের দেশে, এর আর তুলনা হয় না!' বিম্বিসার তখন চপল যুবকের ভূমিকায়। সেই ভূমিকা অনুযায়ীই বলে উঠতেন, 'সে যা বললে! সত্যই অতুলনীয়! অতিথি সেইমাত্র ভাতই খেয়ে আসুক, আর অতিথি অজীর্ণ উদরাময় আমাশাতে কাতরই থাকুক, ঠেসে কিছু খাইয়ে দেওয়ার তুল্য সৌজন্য আর কি আছে? 'অসময়' বলে কোনো কথাই নেই!'

নীলাঞ্জনা হাসতো, আবার গম্ভীর হতো। বলতো, 'যে কোনো কিছুকে নিয়ে ঠাট্টা করলেই ঠাট্টা করা যায়, বুঝলে বিম্ব! কিন্তু তার সৌন্দর্যকে অস্বীকার করবে কেন?···আমাদের দেশে অতিথিকে নারায়ণের মূল্য দেওয়া হয়। তাই তো তার জন্যে সবটাই 'সময়', 'সুসময়'। অসময় বলে কিছু নেই। তার জন্যে তাই হৃদয়ের দরজার প্রতীক রান্নাঘরের দরজাটি সর্বদাই খোলা রাখা নিয়ম।'

'দুঃখের বিষয় 'অতিথি নারায়ণ'রা অষ্টধাতুর নয়। তারা দস্তুরমত

রক্তমাংসের মানুষ। তাদের ইচ্ছে অনিচ্ছে ভাল লাগা মন্দ লাগা অনেক কিছুই থাকতে পারে।'

'থাকুক! থাক!' নীলাঞ্জনা জোর দিয়ে বলেছে 'তবু আমি আমাদের দেশের এ প্রথাকে সম্মান করি।'

আরো বহু প্রথাকেই করি। হাজার হাজার বছরের শিক্ষা সংস্কৃতি আদর্শ চিন্তাধারা সব একেবারে বাজে? মূল্যহীন, ব্যর্থ? তা' হতে পারে না বিম্ব, আমরাই বাজে হয়ে যাচ্ছি দিন দিন, মূল্যবানের মূল্য জোগাতে পারছি না। 'দ্রাক্ষাফল অতিশয় অম্ল'র মত জোর গলায় বলছি—'ও আদর্শ অবাস্তব, ও প্রথা অর্থহীন, ও সংস্কার কুসংস্কার।'

আগে এত কথা বলতে জানত না নীলাঞ্জনা।

আগে হালকা গলায় হেসে হেসে যা বলতো, তা' থেকে তা'র সেই সেকেলে মনটিকে বোঝা যেত শুধু। আভাসে, চকিতে।

এসব কথা নীলাঞ্জনা পরে শিখেছিল।

সুমিত্র যখন নোয়াখালি চলে গিয়েছিল নীলাঞ্জনাকে রেখে, তখন।

বিম্বই শুধু তখন দেখাশুনো করতো নীলাঞ্জনাকে।

তা সে বিম্বই একদিন রাগ করে বলে ফেলেছিল, 'এত তো দেশের ঐতিহ্য মানো, প্রেমে পড়তে গেলে কেন তবে? প্রেমে পড়ে ভিন্ন জাতে বিয়ে করা বুঝি আমাদের দেশের ঐতিহ্য?'

নীলাঞ্জনা বলেছিল, 'কেন নয় বিম্ব? জাতিভেদ তো একালের সৃষ্টি। রাজারাজড়াদের খেয়াল আর স্বার্থ বজায় রাখবার কূট-কৌশল। কিন্তু প্রেমে পড়তে কোথায় নিষেধ আছে বল? প্রেমেরই তো দেশ! দেবাদিদেব মহাদেব দিয়ে যার সুরু!···কত প্রেমের কাহিনী, কত প্রেমের নিশ্বাস এদেশের আকাশে বাতাসে ধুলোয় ঘাসে···'

তর্ক চলতো।

বিম্ব ওই জোলো ভাবপ্রবণতাকে টুকরো টুকরো করে কাটতো, ধূলো ধূলো করে উড়িয়ে দিতো, কিন্তু নীলাঞ্জনা রেগে উঠত না। নীলাঞ্জনা তার স্থির প্রত্যয়ের ঔজ্জ্বল্যটুকু মুখে মেখে বিম্বর সব কটুকথা শুনতো বসে বসে। মা যেমন অবোধ ছেলের পাগলামী শোনে স্নেহের সঙ্গে প্রশ্রয়ের সঙ্গে।

বিম্ব যখন চলে আসতো, তখন হেসে বলতো, 'তূণটা তো খালি করে গেলে, যাও আবার খুঁজে পেতে নতুন তূণ ভরো গে! আগামী দিনের যুদ্ধসজ্জা!'

আর বিম্ব পথে বেরিয়েই অবাক হয়ে ভাবতো, যে সব কথা আমারও কথা, যে বিশ্বাস আমারও বিশ্বাস, এতক্ষণ বসে বসে তার বিরুদ্ধেও যুক্তি প্রয়োগ করে এলাম কেন?

সে কি শুধু নীলাঞ্জনার কাছে বেশীক্ষণ বসে থাকার সপক্ষে যুক্তি? যে যুক্তি নিজেকে দিতে হয়!

প্রসাদ অবশ্য চলে যেতে উঠছিল, চা এল তখন, অতএব বসতে হল। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা মিসেস দস্তিদার বলে কোনো মহিলা থাকেন এ পাড়াতে!'

বিম্বিসার চকিত হলেন। এইটিই প্রসাদ অধিকারীর 'উপলক্ষ' না কি? মিসেস দস্তিদার সম্পর্কে পাড়ায় খুব একটা সুনাম নেই। ওঁর অতীতটা নাকি এ পাড়ার বাসিন্দাদের অজ্ঞাত। অথচ এই শহরতলীর মত জায়গাটায় নতুন করে গড়ে ওঠা পাড়ার পাড়াতুতোরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু।

বিম্বিসার টের পান কেমন করে? বিম্বিসারের ঘরে তো সংবাদ-দাতা নেই…গৃহিণী নেই! কিন্তু বিম্বিসারের ভাগ্নে আছে।

রক-প্রেমী ভাগ্নে।

ওকে মধ্যমণি করেই নাকি এই নতুন পাড়ার রক-মজলিসটি আস্তে আস্তে সুগঠিত হয়ে উঠেছে। 'লেখক' বলে মামাকে আলাদা কোনো সমীহ সে করে না। যখন সুবিধে পায়, খুব খানিকটা বকবক করে যায়। এবং তখনই আশ্চর্য হয়ে অনুভব করেন বিম্বিসার, জগতের সমস্ত খবরই তার নখদর্পণে! এখন এখানে নেই তাই, নচেৎ এই প্রসাদ অধিকারীর প্রশ্নের উত্তর সেই দিয়ে বসতো নাকে মুখে!

প্রসাদকে সেও চেনে বৈকি। তার ছোটমামার বন্ধু তো!

ভাগ্যে এখন নেই।

বিম্বিসারই বলেন, 'মিসেস দস্তিদার? আছেন জানি! কেন তিনি আবার তোমার শিকারের আওতায় এসে পড়েছেন না কি?'

'আঃ বিম্বিদা, কী যে ভাবেন আপনি আমাদের! আমরা যেন সমাজের মানুষ নই? আপনার বৌমা খোঁজ নিতে বলেছিল। ওদের বাপের বাড়ির পাড়ায় না কি মহিলাটি থাকতেন কবে, ওরা 'মাসীমা' ডাকতো!...বলছিল—যাচ্ছ, খোঁজ নিও তো।...দেখব উনিই কি না। আচ্ছা উনি কি একা থাকেন? বয়েস কত?'

বিম্বিসার কি 'সন্ধানী পুলিশে'র সরলতায় বিশ্বাস করবেন? নাঃ। এ সমস্তই ছল হতে পারে। মূল কথা ওই মহিলাটি!

হঠাৎ হেসে উঠলেন বিম্বিসার। বললেন, 'বয়েস? মিসেস দস্তিদারের বয়েসের কথা জানতে চাইছ? আচ্ছা সর্বনেশে লোক তো তুমি? শুনতে পাওয়া যায় কে কবে যেন ওঁকে ওঁর বয়েস জিগ্যেস করেছিল, উনি তাকে ওঁর 'অ্যালসেশিয়ান'টাকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন!'

হা হা করে হেসে ওঠে প্রসাদ অধিকারী। বলে, 'গল্প শুধু আপনি কাগজে কালিতেই লেখেন না দেখছি।'

'গল্প? গল্প মানে? দস্তুরমত ফ্যাক্ট!'

প্রসাদ অধিকারী ওঠে।

আর যাবার সময় হঠাৎ মনে পড়ার মত বলে ওঠে, 'হ্যাঁ ভাল কথা, আমি যখন আসছি, দেখলাম একটি মহিলা গেলেন আপনার এখান থেকে, উনি এখানের কোন আশ্রমের সেক্রেটারী না?'

বিম্বিসার ভাবলেন, 'আজ তা'হলে তুমি মহিলা শিকারেই বেরিয়েছ! কিন্তু ওখানে কিছু লাভ হবে না।' মুখে হেসে বলেন, 'কেন, কোনো সময় তোমার পকেটের দিকেও হাত বাড়িয়ে ছিলেন বুঝি?'

'কি? চাঁদার কথা বলছেন? আরে না না! ওঁকে একবার আপনাদের ওই পার্কের মধ্যে বক্তৃতা করতে দেখেছিলাম।'

বিম্বিসার মৃদুহাস্যে বলেন, 'খুব ওজস্বিনী ভাষায় বোধহয়?'

'সাংঘাতিক!'

প্রসাদ চলে যেতে বিম্বিসারও মনে মনে বললেন, তোমরাও সাংঘাতিক! ভাল মানুষটি সেজে এখন মহিলা শিকারের ভান করে বেড়াচ্ছ। দেবী আশ্রমের দেবীর দিকেও দৃষ্টি! যাওনা একবার ওখানে। বুঝবে ঠ্যালা! হয়তো তোমার স্কন্ধেই ভর করে পুলিশ অফিস থেকেই মোটা সোটা একটা 'ডোনেশান' বাগিয়ে নেবেন! ওঁর ওই আশ্রমের স্বার্থ অথবা উন্নতি ব্যতীত জগতে যে আর কিছু থাকা উচিত একথা তো মহিলাটি মানেন না! তবে—বিম্বিসার ভাবলেন, মিসেস দস্তিদারকে নিয়েই ভাবনা!

কথাটা সত্যি। মিসেস দস্তিদার যে কি তা' কেউ জানে না! মহিলাটি সধবা কি বিধবা বোঝা দুরূহ। 'মিসেস' শব্দটা থেকে এইটুকু বোঝা যায় কুমারী নন। তবে সর্ববিধ সাজই করে থাকেন মিসেস দস্তিদার। কখনো ফুললতাপাতা আঁকা অতি জমকালো শাড়ি, লাল নীল হলদে সবুজ শার্টিন মখমল ব্রোকেড্ নাইলনের ব্লাউস, খোঁপায় বেলের 'গোড়ে', পায়ে জরির নাগরা, গলায় নকল

মুক্তো; কখনো শাদা ধনেখালি শাড়ি, মৃদু ধূসর রঙা ব্লাউস, প্লেন রুলি, চেনহার, টান করে বাঁধা খোঁপা, আবার কখনো স্রেফ্ শাদা ব্লাউস, শাদা থান, শাদা চটি, শাদা বটুয়া। সেদিন মিসেস দস্তিদারের হাত খালি, গলা খালি, চুল আবাঁধা রুক্ষু! হয়তো কোনো জমকালো উৎসবের আসরেই এই বিধবা সাজটি সেজে এসে দাঁড়ালেন মিসেস দস্তিদার! বারবার বলতে লাগলেন, 'উঃ কী গরম! কী করে যে লোকে এত শাড়ি গহনা পরে বেড়াচ্ছে! আমি তো সাতখানা বেনারসী ঘরে ছড়িয়ে রেখে এই ভয়েল থানখানা জড়িয়ে চলে এলাম।'

কিন্তু ঠিক এর পরদিনই হয়তো কোনো শ্রাদ্ধবাসরে কি কোনো শোকসভায় মিসেস দস্তিদার তাঁর সেই 'খোঁপার মালা' সেট্‌টি পরে আবির্ভূত হলেন। সেদিন তিনি কম প্রসাধিতা মহিলাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'পাঁচজনের সামনে ভিখিরির মত আসতে পারি না বাবা! আর শোকসভা, অতএব যেমন-তেমন করে আসবো, এটা নেহাতই 'ফর শো' বলে মনে হয় আমার! বরং জমকালোই ভাল।'

কথার মাঝখানে চিরুণী বার করে চুল আঁচড়ে নেন, রুমাল বার করে ঘাড় মুছে নেন, পাউডার বার করে মুখ ঘষে নেন।

বাড়িতে মাত্র একটা ঝি আর একটা বাঘের মত কুকুর ছাড়া আর কেউ নেই মিসেস দস্তিদারের। সংসার চলে কোন্ টাকায় তা' কেউ জানে না। মিসেস দস্তিদারের উপর সন্ধানী পুলিশের নজর পড়া বিচিত্র নয়।

কে জানে—ওঁর অতীতটা কি? কোন্ চরিত্রের মানুষ উনি?

এই মিসেস দস্তিদারের কথা ভাবতে গিয়ে নীলাঞ্জনার সেই কথাটা মনে পড়ল বিম্বিসার রায়ের।

নীলাঞ্জনা যখন একা থাকতো, তখনকার কথা। নীলাঞ্জনা

বলেছিল 'একটা মেয়ের একা থাকা যে কী তুরূহ বিম্ব ! ইচ্ছে হয় যে বাঘের মত একটা কুকুর পুষি ! আমাদের দেশটা যে কবে এইটাকে সহজ করে নিতে পারবে !' সেকেলে আর একেলে তু'রকম কথাই বলতো নীলাঞ্জনা। সে যুগ আর এ যুগের যোগফল যেন নীলাঞ্জনা ! যখন সুমিত্র ওকে ছেড়ে চলে যায় নি, তখন বলেছিল সে এ কথা।

'না, তুমি যেন একাল আর সেকালের সংমিশ্রণ !'

'আর'—নীলাঞ্জনা রেগে বলতো, 'তুমি হচ্ছ একটি ভূত আর অদ্ভুতের সংমিশ্রণ !' এ রাগ কেন নীলাঞ্জনার, বিম্বিসারের কি অজানা ছিল ? না অজানা ছিল না।

সুমিত্র তার কাছে কোনো কথা গোপন করত না। বলতো, 'আচ্ছা তুই বলতো, বিয়ে করলেই সংসার বৃদ্ধি করে জড়িয়ে পড়তে হবে এর কোনো মানে আছে ?'

বিম্ব ভুরু কোঁচকাতো। বলতো, 'প্রসঙ্গটা ঠিক কি, না জানলে মানে আছে কি না বলি কি করে ?'

'আরে বাবা, বুঝছিস না ? জীবনের নক্সা নিয়ে মহাতর্ক চলছে প্রেয়সীর সঙ্গে !...আমি বলছি দেশের কাজ করো দশের কাজ করো, সমাজের কাজ করো, টাকা কটার সদ্ব্যয় হয়ে যাক, শেষ জীবনটা কর্তা-গিন্নী মঠে মিশনে, ব্যস চুকে গেল ল্যাঠা। কৃতকর্মের জের রেখে যেতে হবে না, ভুল করে যে একদা পৃথিবী নামক গ্রহে এসে জন্মেছিলাম, তার সাক্ষ্য রেখে যেতে হবে না।...তা' শুনছে না। তুমুল আপত্তি চালাচ্ছে। বলছে এ সব না কি অবাস্তব কল্পনা। বলে, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ পারেন নি, উনি এলেন ভারী এক দৈত্যিকুলে প্রহ্লাদ ! প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করতে চাওয়া পাগলামী।

বিম্বিসার হেসে বলেছিল, 'ওর যুক্তিকে খুব একটা অবহেলাও করা যায় না।'

'তুই তো তা' বলবিই। সব কথায় ওর সমর্থন করাই তো তোর পেশা। আসল কথা কি জানিস? 'মা' না হতে পেলে না কি ওর জীবনই বৃথা। ও না কি বিয়ের আগে থেকে ভেবেছে কি ভাবে ওর ছেলে মেয়েকে গড়ে তুলবে। সে না কি একেবারে দেশের সম্পদ হবে। শুনেছিস এমন কথা?'

বিম্বিসার বলেছিল, 'লক্ষ্যটা মহৎ সুমিত্র, অস্বীকার করতে পারো না তুমি।'

সুমিত্র কিন্তু অস্বীকারই করেছিল। বলেছিল, 'ও আমি মানি না। দেশে অজস্র ছেলে মেয়ে ছড়ানো পড়ে আছে, তাদের নিয়ে এক একখানি সম্পদ গড়ে তোলো না। আমার সাধনার সঙ্গে সংঘর্ষ নেই তাতে। ও বলবে, নিজের সন্তান, নিজের রক্তমাংসে গড়া বস্তু, তাকে যেভাবে তৈরি করা যায় তা' কি অন্যের ছেলেতে হবে?...আচ্ছা বল বিম্ব, এটা কি ক্ষুদ্রতা নয়? চিত্তের সংকীর্ণতা নয়? ও কেন আরো বড় হবে না, আরো উদার হবে না?'

বিম্বিসার কথাটাকে হালকা করে আনতে চেয়েছিল। হেসে বলেছিল, 'তুমি কেন আরো ফর্সা হলে না, কেন আরো লম্বা হলে না? যেটি সর্বোৎকৃষ্ট সেটিই যে সবাই হবে, এর মানে আছে?'

'আরে আসল কথা তো তা নয়! ওতো বলছে না—এটা ওর দুর্বলতা! ও বলছে—আমার থিয়োরিই ভুল। বলে কি, বেশ দুটো ছেলে মেয়ে হোক আমার, তাতেই সন্তুষ্ট আমি।'

বিম্ব আবার হেসে উঠেছিল। প্রবল হাসি। অস্বাভাবিকই যেন।

'তবে আর কি? বেশী চিন্তা নেই তোমার!'

সুমিত্র গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'দেখ হাসি ঠাট্টার কথা নয়, আমার মনে হয় কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা আছে ওর। ও যেন সেকাল আর একালের জগাখিচুড়ি। কখনো দেখি যথেষ্ট প্রগতিসম্পন্ন দৃষ্টি, কখনো দেখি সেই পচা পুরনো রক্ষণ-

শীলতাকে আঁকড়ে ধরে রাখার মনোবৃত্তি। শুনলে বিশ্বাস করবি, ও সন্তান কামনায় কোথায় না কি ষষ্ঠীতলায় পূজো দেয়, ঘরে শিশু পরিবেষ্টিত মা ষষ্ঠীর ছবি রেখেছে। একে তুই স্বাভাবিকতা বলবি ?'

বিম্ব অবাক হচ্ছিল।

বিম্বও গম্ভীর হয়েছিল। বলেছিল, 'ক-বছর বিয়ে হয়েছে তোদের ?'

'বিয়ে ? দাঁড়া রোস, চার-চার-সাড়ে চার বছর।'

বিম্ব নীলাঞ্জনাকে বলেছিল, 'এটা তোমার একটু বাড়াবাড়ি পাগলামীই নীলাঞ্জনা ! এই ষষ্ঠী ঠাকুরের মানত করা !···কতজনের বিয়ের আট দশ বছর পরেও—'

'বোকার মত কথা বোলো না বিম্ব', নীলাঞ্জনা ঝলসে উঠেছিল, 'না হওয়া আর না হতে দেওয়া দুটো এক কথা নয়। ও আমার সঙ্গে কেবল বন্ধুত্ব সম্পর্ক পাতিয়ে রেখে দিতে চায়।···ইস একবার একটা 'টুইন' বেবিও যদি হয় আমার !'

বিম্ব চমকে উঠেছিল। তা' এ একরকম পাগলামীই বৈকি, ভেবেছিল বিম্ব। তারপর সুমিত্রর কথাই পুনরাবৃত্তি করেছিল। 'দেখো সন্তান যে আসবেই তারও তো নিশ্চয়তা নেই ! দেশের জন্যে ভাল ছেলে মেয়ে গড়তে চাও তো—'

নীলাঞ্জনা বিম্বিসারের বাহুমূলে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে ওর কথা থামিয়ে দিয়েছিল। তারপর কেঁদেছিল।

হ্যাঁ, চোখের জল পড়েছিল নীলাঞ্জনার।

'আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি বিম্ব, যা জগৎ সংসারের চির স্বাভাবিক ঘটনা, আমার ভাগ্যেই তা বদলে যাচ্ছে। অথচ ওকে তোমরা কেউ পাগল বলছো না, বলছ আমায়। ওর দেশের কাজ ভাল লাগে,

ও করবেই। তার জন্যে ও ওদের লক্ষ লক্ষ টাকা শেষ করবে। যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে বন্যা, যেখানে দাঙ্গা, যেখানে অগ্নিকাণ্ড, সেখানেই ছুটবে, ওর আত্মীয়সমাজ, ওর বন্ধুসমাজ, ওর বিবাহিতা স্ত্রী, কাউকে তার ন্যায্য পাওনা দেবে না, তবু মস্ত এক সমাজসেবী নাম নিয়ে টপের ওপর বসে থাকবে। অথচ আমার যা স্বপ্ন, যা চিন্তা, যা লক্ষ্য, আমি তা' পাবো না। কেন আমি তা মানবো?'

বিম্বর মনে হয়েছিল হিস্টিরিয়ার লক্ষণ এটা। এবং তার যা কারণ আবিষ্কার করেছিল, হয়তো সেটা নিছক 'মা-যশোদার' অনুকূল নয়। কিন্তু সে তো ভিতরের কথা।

সে কথা নিয়ে কথা বলতে নেই, ভেবেছিল বিম্ব।

আরো একদিন ডেকে পাঠিয়েছিল নীলাঞ্জনা, বলেছিল, 'আচ্ছা বিম্ব, তোমার ওই নতুন বইয়ের নায়িকাটাকে মেরে ফেললে কেন তুমি? ওকে কি তুমি বাঁচাতে পারতে না? সবই তো তোমার হাতে।'

বিম্বিসার হেসেছিল।

করুণার হাসি। লেখকদের সম্বন্ধে ওদের ধারণার বহর দেখে হাসিই পেয়েছিল ওর। বলেছিল, 'তা' হয় না নীলাঞ্জনা, ইচ্ছে করলেই বাঁচাতে পারি না। বিধাতা পুরুষের মতই অসহায় আমরা। প্লট আমার, কিন্তু চরিত্ররা স্বাধীন স্বয়ং প্রভু। তারা কি করবে না করবে তারাই জানে। আমি শুধু লিপিকার। আমি যে মূর্তিকে মনের মধ্যে লালন করে প্লটকে গাঁথতে বসি, সে মূর্তির যে কী রূপান্তর ঘটবে আমার তা' আগে থেকে বোঝার সাধ্য নেই।'

নীলাঞ্জনা বিশ্বাস করে নি।

নীলাঞ্জনা উড়িয়ে দিয়েছিল বিম্বর কথা। বলেছিল, ওসব বানানো গোছানো কবিত্বর কথা রাখো বিম্ব! আসল কথা বাঁচাবার চেষ্টাই তোমাদের নেই, নেই মানুষ বলে দরদ। তাই তোমরা কেবল

দেখতে পাচ্ছো মানুষ নষ্ট হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হচ্ছে। সেই ঘুণধরা সমাজের ছবি আঁকছো তোমরা। বাস্তব ছবি দিচ্ছি বলে উৎসাহের শেষ নেই। ওরকম কোরো না বিম্ব! আশার ছবি আঁকো।

বিম্ব বলেছিল, ''বেহুলার ভেলা' নেহাৎই গল্পের কাহিনী নীলাঞ্জনা! আজকে আর সে গল্পে কেউ ভোলে না। আজকের মানুষ আর বেহুলার ভেলায় চড়ে স্বর্গে পেঁীছতে পারে না।'

তবু নীলাঞ্জনা বলেছিল, 'আমার হাতে যদি কলম থাকতো বিম্ব!'

'কি করতে শুনি?'

'তোমার ওই নায়িকার মত হার মানাতাম না আমার নায়িকাকে। জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় করে তুলতাম না তার কাছে।'

অথচ নীলাঞ্জনা নিজেই হার মানল। নীলাঞ্জনা জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করল।

সেদিনের কথা কি কোনোদিন ভুলে যাবেন বিম্বিসার? যেদিন প্রথম সুমিত্র এসে বলল, 'বিম্ব, আমি চলে যাচ্ছি'। রাতদিনই তো এখান ওখানে যায় সুমিত্র, এমন ঘটা করে এসে বলে না কোনোদিন। তাই বিম্বিসার বলেছিল, 'খুব একটা নতুন খবর বলে তো মনে হচ্ছে না।'

তখনও বন্ধুর মুখটা ভাল করে দেখেনি বিম্ব। তাই বলতে পেরেছিল, তারপর চমকে তাকাল। বলল, 'কী হয়েছে তোর?'

সুমিত্র যেন হাসল। বলল, 'না, হবে কি?'

'মুখের চেহারা ভীষণ খারাপ দেখাচ্ছে কিন্তু—'

'কিছু না, কিছু না, খারাপ কিসের?' সুমিত্র এবার হঠাৎ হো

হো করে হেসেই উঠল, 'তোমার বান্ধবী মা-যশোদার স্বপ্ন সফল করে তুলছে, এতে তো আহ্লাদে চেহারা ভাল হয়ে যাবার কথা।'

বিম্ব ওর রাগের কারণ বুঝে ফেলেছিল। বুঝে একটু আশ্চর্য হয়েছিল। হাত ধরে ফেলে বলেছিল, 'সত্যিই তো ভাল খবর সুমিত্র, এতে তুই এত বিচলিত হচ্ছিস কেন? সত্যি তো তুই কোন গুরুর পাদপদ্ম ছুঁয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করিসনি যে, পতিত হয়ে গেছিস! ঘরে এক আধটি শিশু থাকলে—'

সুমিত্র চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে হঠাৎ চুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরে বলে উঠল, 'আমার কথা আসছে কোথা থেকে বিম্ব? আমার কথা কেন? আমি কে?'

সুমিত্র তো সমাজধর্ম জাতিকুল, নিয়ম-আচার এসবের কিছু মানত না, তবু সুমিত্র ওর চুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরে চড়া গলায় বলে উঠেছিল—'আমি কে? আমি এখানে তৃতীয় ব্যক্তি মাত্র।'

বিম্বিসার ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে কাঁধটা চেপে ধরেছিল। কড়া-গলায় বলে উঠেছিল, 'কী বকছিস আবোল তাবোল? আসলে বলতে চাইছিস কি?'

তখনো বিম্ব ভেবেছিল, নীলাঞ্জনার অবুঝ আকুলতায় ব্রতচ্যুত হয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছে সুমিত্র। হ্যাঁ তাই ভেবেছিল।

তা' ছাড়া আর কি ভাববে? আর কি ভাবা সম্ভব? তাই বলেছিল, 'বলতে চাইছিস কী তুই?' সুমিত্র ওর হাতটা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলেছিল। সুমিত্রকে একটা হিংস্র জানোয়ারের মত দেখাচ্ছিল। সাপের মত নিশ্বাস পড়ছিল সুমিত্রর। সুমিত্র বলেছিল, 'না, বলবার মত বিশেষ কিছু নেই। শুধু খবরটা জানাচ্ছি তোমায়, দেশের সেই ভাবী সম্পদ, সেই ভবিষ্যৎ মহামানবটি যে

নীলাঞ্জনাকে 'মা' করে দিয়ে স্বর্গের দরজায় পৌঁছে দেবে, সে শুধুই নীলাঞ্জনার। নীলাঞ্জনা তার 'মা', আমি তার 'বাবা' নই !'

সুমিত্র চলে গিয়েছিল। নোয়াখালিতে চলে গিয়েছিল সুমিত্র।

বিম্বিসারেরও কি উচিত ছিল না চলে যাওয়া ? নোয়াখালিতে না হোক আর কোথাও ? শুধু নীলাঞ্জনার সংস্রব ত্যাগ করবার জন্যেই কোথাও ? সুমিত্রই তো তার বন্ধু। চিরদিনের বন্ধু।

নীলাঞ্জনার সঙ্গে পরিচয় তো সুমিত্রর সূত্রেই ? এখন নীলাঞ্জনার পরিচয় বন্ধুর অবিশ্বাসিনী স্ত্রী বলে ! তবে ? তবে কেন বিম্বিসার নীলাঞ্জনার কাছেই ছুটে গিয়েছিল ?

সুমিত্রর কথায় বিশ্বাস করতে পারে নি বলে ? সুমিত্রর মুখের চেহারায় কি অবিশ্বাসের অবকাশ ছিল ? হয় তো ছিল না।

তবু বিম্বিসার নীলাঞ্জনার কাছে গিয়েছিল। বলেছিল, 'নীলাঞ্জনা, সুমিত্রকে এত চটিয়ে দিলে কি করে ? রেগে আগুন হয়ে যা তা বলল—'

নীলাঞ্জনা তখন সুমিত্রর সেই বিরাট বাড়ির বিরাট একটা ঘরে বিরাট এক পালঙ্কে একা বসেছিল চুপচাপ। নীলাঞ্জনার শাশুড়ীর আমলের এই পালঙ্কটায় নীলাঞ্জনা অবশ্য একাই শুতো।...

সুমিত্রও পাশের ঘরে একটা নেয়ারের খাটে। সুমিত্রর ঘরে বাহুল্য বলতে কিছু ছিল না। সুমিত্র বলতো, 'বস্তুর ভার আমায় বেঁধে মারে।' কিন্তু নীলাঞ্জনা তা' বলত না।

নীলাঞ্জনা বলতো, 'বস্তুর মধ্যে দিয়েই তো স্পর্শ। ভালবাসার স্পর্শ, আগ্রহের স্পর্শ, প্রাণের স্পর্শ, স্মৃতির স্পর্শ ! এ ঘরের এই উপকরণের স্তূপ আমার কাছে 'বোঝা' নয়, আমার সেই শ্বশুর-শাশুড়ী যাঁদের চোখে দেখিনি, তাঁদের দেখতে পাই আমি এই সব বস্তুর মধ্যে, তাঁদের রুচি পছন্দ প্রকৃতি !' নীলাঞ্জনার ঘর অনেক জিনিসে ভরা। নীলাঞ্জনার ঘরের চেহারা বিগত যুগের। সেই ঘরে বিগত যুগের মতই বসেছিল নীলাঞ্জনা।

হ্যাঁ, নীলাঞ্জনার সেই জানালার দিকে মুখ করে বসে থাকা চেহারাটা দেখেই বিম্বিসারের মনে হয়েছিল নীলাঞ্জনা যেন চলতি কালের নয়। যেন হারিয়ে যাওয়া কোনোদিনের।

তবু সহজ হবার চেষ্টা করেছিল বিম্বিসার, বলেছিল, 'সুমিত্রকে এত চটিয়ে দিলে কি করে?'

নীলাঞ্জনা বিম্বিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিকে একটু হেসে বলেছিল, 'সুমিত্র খুব চটেছে এই মনে হল তোমার?'

'তা' বেশী প্রাঞ্জল করে বললে বলতে হয়, মর্মাহত হয়েছে। অত পারছি না। কিন্তু কি হয়েছে নীলাঞ্জনা সত্যি বলবে না?'

নীলাঞ্জনা তার বড় বড় চোখ দুটো তুলে একটু চেয়ে থেকে বলল, 'ও যা বলেছে তাই সত্যি!'

'নীলাঞ্জনা! নীলাঞ্জনা!'

'তুমিও তো ওর মতই বিচলিত হয়ে উঠছ দেখছি!' নীলাঞ্জনা হেসে উঠল। 'তোমরা ছেলেরা সবাই তাহলে একই রকম?' তারপর গভীর পরিতাপের মত একটা নিশ্বাস ফেলল নীলাঞ্জনা। বলল, 'কত ভুলই ভাঙে, কত ধারণাই ভাঙে।'

বিম্বিসার বলল—'নীলাঞ্জনা তুমি আমার লেখা বই পড়ে বিচলিত হতে, মানুষ যে দিনের দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে, এ তুমি বিশ্বাস করতে না, অথচ তুমি নিজে এ কী করলে?'

নীলাঞ্জনা বলল, 'তুমি বড় উত্তেজিত হয়েছ বিম্ব, বোস ঠাণ্ডা হও।...নইলে তুমিও হয়তো ছিটকে বেরিয়ে যাবে, 'জীবনে আর আসবো না' বলে।

বসেছিল বিম্বিসার। নীলাঞ্জনার মুখের কথা না শুনে নীলাঞ্জনাকে

ঘৃণা করতে দ্বিধা হচ্ছিল হয়তো। বসে বলেছিল, 'বল, তোমার কি বলার আছে বল।'

নীলাঞ্জনা বলেছিল, 'বিম্ব, আর কেউ হলে নিশ্চয় বলতাম, বলবার কিছু নেই আমার! অন্তত তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার! সুমিত্র যখন ওর রিভলবারটা নিয়ে চলে এসেছিল আমার ঘরে—'

'নীলাঞ্জনা!' বিম্বিসার প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল। 'নীলাঞ্জনা বলছ কী?'

নীলাঞ্জনা বলেছিল, 'আর বোলোনা বিম্ব! আমিও তাই বলেছিলাম ওকে, একটা সস্তা ডিটেকটিভ গল্পের নায়কের মত দেখাচ্ছে তোমাকে। রিভলবারটা ফেলে দিয়ে ও আমার হাত চেপে ধরেছিল, এই দেখ কালশিরের দাগ!…চেপে ধরে বলেছিল, 'বল কেন এ কাজ করলে? বলতেই হবে বল!' কাঁপছিল ও বলতে বলতে!'

আমি বললাম, 'কৈফিয়ৎ আমি দেব না। বলব না—কেন, কিসের জন্যে!'

'বলবে না?' বলে গর্জন করে উঠেছিল সুমিত্র। আমি বলেছিলাম, 'না বলবো না! কারণ বক্তব্যটা আকস্মিক নয়। তোমার কাছে অনেক মিনতির, অনেক ইচ্ছের, অনেক যুক্তির ডালা সাজিয়ে রেখে বসে বসে অপেক্ষা করেছি এতদিন, তুমি তাকিয়ে দেখনি। আজ আমি সেই ডালাটা তুলে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলাম, কি ধূলোয় বিছিয়ে দিলাম, তা' দেখতে আসছো কেন? তুমি যেতে পারো। রিভলবারটার সদ্ব্যবহার করেও যেতে পারো। জোরালো ডিটেকটিভ গল্পের মত 'জোড়া খুনে'র খুনী হয়ে কোর্টে গিয়ে ধরা দিতে পারো। ফেরারি আসামী হয়ে পালিয়ে বেড়াতে পারো। যা ইচ্ছে। তবে আমার আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তুমি। আমার কাছে তোমার আর অস্তিত্ব নেই।' ও

ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিম্ব, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমায় না বললে বুঝি স্বস্তি পাবোনা! কেন এমন হচ্ছে কে জানে।'...

বিম্বিসার বলেছিল, 'বল কি বলবে?'

'তাইতো ভাবছি' নীলাঞ্জনা শিথিল ভঙ্গী ত্যাগ করে খাড়া হয়ে বসেছিল, 'বললাম তো ঘটা করে 'সব' বলব, কিন্তু এখন তো ভেবে পাচ্ছি না নতুন কি বলার আছে।...সুমিত্র তোমায় যা বলে গেছে সেই তো কথা। একমাত্র কথা, শেষ কথা!'

'নীলাঞ্জনা, এ কী করলে তুমি? কেন এমন করলে?'

'বিম্ব!'

আরো সোজা হয়ে উঠে বসেছিল নীলাঞ্জনা। বলেছিল, 'বিম্ব, তোমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজতে পারো, তোমরা নিজের জীবনকে নিজের ছাঁচে ঢালাই করতে পারো, শুধু আমরাই পারবো না মেয়ে বলে? বলতে পারো কেন?'

'নীলাঞ্জনা, সার্থকতার চেহারা সভ্য না হলে, সুন্দর না হলে, পুরুষরাও নিন্দিতই হয়।'

নীলাঞ্জনা বলে, 'তোমার মতে সুমিত্রর ওই চেহারাটা খুব সুন্দর? সুমিত্র একটা বনেদী বাড়ির ছেলে, তাদের বংশের ঐতিহ্যের বাহক। সুমিত্রর বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণের কতই না কি সমারোহ ছিল, সুমিত্র সেই দোল দুর্গোৎসব কালী পূজো জগদ্ধাত্রী পূজো ঝুলন রাস আরো কত কি, সব উঠিয়ে দিল, ভিখিরির চেহারা নিল, একে তুমি সুন্দর বল?'

'আমাদের দেশে ত্যাগই সকলের থেকে সুন্দর নীলাঞ্জনা!'

'ত্যাগ!' নীলাঞ্জনার তীক্ষ্ণ হাসি যেন বিম্বিসারের ওই অক্ষরে কম ওজনে ভারী কথাটাকে ধূলো ধূলো করে উড়িয়ে দিয়েছিল।

'থাক্ বিম্ব, ত্যাগের কথা আর বোলোনা। কতকগুলো জড়বস্তু ত্যাগ করাকেই 'ত্যাগ' বলে না। ত্যাগের প্রথম সোপান কি শোনো

নি কখনো ?···আমাকে ও ঠাট্টা করে বলতো 'বস্তুসর্বস্ব', বলতো, 'এইগুলো তোমার কাছে এত মূল্যবান কেন ভেবে অবাক হই। এই ঘরবাড়ি টাকাকড়ি অশন বসন !' ওর এই অবাক হওয়াটাই যে ওর পক্ষে কত ঠাট্টা তা যদি বুঝতো ! কিন্তু আমি তো বুঝতাম এই বস্তুর বোঝাই ওর কাছে কতখানি ! তাই ওইগুলোকে ত্যাগ করে করেই মস্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, নিজেকে এক 'পরমত্যাগী মহাপুরুষ' ভেবে আহ্লাদে ভেসেছে।···কিন্তু বিম্ব, রাগ হিংসা অধিকারবোধ, গতানুগতিক সমাজের সংস্কার, এ সবই যদি ছাড়তে না পারলো—'

'হয়তো তাই—তবু নীলাঞ্জনা তোমার বিবেচনাকে নির্ভুল বলতে পারবো না আমি। দেশকে তুমি যে মহৎ সম্পদটি উপহার দিয়ে নিজে সার্থক হবে, তাকে তুমি কী দেবে ? কোন পরিচয় ? পিতৃ-পরিচয়হীন খৃস্টকে তুমি এ যুগে কোথায় দাঁড় করাবে ?'

নীলাঞ্জনা গভীর একটা নিশ্বাস ফেলেছিল। নীলাঞ্জনার চোখে জলের ছায়া ছলছলিয়ে উঠেছিল। নীলাঞ্জনা বলেছিল, 'সেই প্রশ্নের কাছেই তো হেরে যাচ্ছি বিম্ব ! সুমিত্রকে আমি আগে এমন করে বুঝতে পারিনি ! ভেবেছিলাম সুমিত্রর 'ত্যাগ' বুঝি তার ভিতরের জিনিস। তাই ভেবেছিলাম এটা সুমিত্রর কাছে সহজ হবে। সহজ মনেই আমার বিবেচনাকে মেনে নেবে। সুমিত্র যদি রটনা করে না বেড়াত, তা হলে পৃথিবীর কেউ একথা জানতে পারত না। সুমিত্র যদি একটু উদার হতে পারতো, তা হলে তো আমাকে মরতে হতো না !'

'নীলাঞ্জনা', বিম্বিসার চমকে উঠেছিল, 'নীলাঞ্জনা তোমার মতলবটা কী ?'

'ভয় নেই বিম্ব, এক্ষুনি মরছি না। কিন্তু মরতে তো হবেই। বাঁচতে তো দিল না সুমিত্র। তোমরা কেউ আমাদের বাঁচতে দিতে রাজী নও বিম্ব ! তোমরা পুরুষরা ! তুমি তোমার গল্পের

নায়িকাকে বাঁচতে দাও না, তোমার বন্ধু তার জীবনের নায়িকাকে বাঁচতে দেয় না !···বাপ ভাই ছেলে, কেউই কি দেয় ? দেয় না ! মেয়েদেরকে তোমরা নিজেদের বাঁচার উপকরণ ছাড়া আর কিছু ভাবো না।'···

সেদিনের বিম্বিসার নীলাঞ্জনার সেই তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গভরা মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেনি, আজকের বিম্বিসার সেই মুখটাকে ভাবলেন। না, ভুলে যাননি। সেই মুখটা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। ভাবলেই চোখের ওপর দেখতে পাওয়া যায়। মনে মনে সেই মুখের কাছে বললেন, 'নীলাঞ্জনা, কাল বদলাচ্ছে, মন বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে ! তাই বাঁচা মরার ধরণও বদলাচ্ছে ! আজকে যদি তুমি এই সমাজকে দেখতে, হয়তো অমন ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে না, তাচ্ছিল্যে বঙ্কিম হয়ে উঠতে না !···আজকে মিসেস দস্তিদাররাই সমাজের উচ্চাসনে গিয়ে বসেন, সবচেয়ে মান্যের নেমন্তন্ন কার্ড আগে ওঁদের ঠিকানায় পৌঁছয় ! অথচ তোমার সেই তুচ্ছ ছেলেমানুষীটুকুর জন্যে বাঁচতে পেলেনা তুমি !'

হঠাৎ টেবিলের কাগজপত্র ঠেলে উঠে পড়লেন বিম্বিসার।

বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। একটু বাইরের হাওয়া চাইছে মাথাটা ! কিন্তু শহরতলীর এই নতুন পাড়ার বসতিতে বিড়ম্বনা অনেক। তবু সেই বহুবিধ বিড়ম্বনার মধ্যে বোধকরি সব থেকে বড় বিড়ম্বনা, সরু সরু ঘরোয়া রাস্তার দু' পাশের সমস্ত বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে মুখ-চেনার আলাপ রাখা।

পথে বেরোলেই 'এই যে নমস্কার !' এর চাইতে বিড়ম্বনা আর কি আছে ? অতএব বিম্বিসারের যখন মাথাটা প্রবল দাবী জানাচ্ছে খোলা হাওয়ার জন্যে, তখনও মিসেস দস্তিদারদের কাছে আত্মসমর্পণ

করতে হয়। মিসেস দস্তিদার কি সব সময় রাস্তায় থাকেন? মনে হল বিম্বিসারের।

পথে বেরোলেই ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়া অনিবার্য। আজও সেই অনিবার্যকে এড়ানো গেল না। মিসেস যুক্তকরের লীলায়িত ভঙ্গীটিকে 'সমে' এনে বললেন, 'এমন সময় বেরোচ্ছেন যে?'

বিম্বিসার যদি তাঁর অন্য অন্য সাহিত্যিক বন্ধুদের মত উন্নাসিক হতেন, তা হলে হয়তো বিম্বিসার শুনতে না পাওয়ার ভান করে চলে যেতেন। কিন্তু বিম্বিসার ভদ্র। বিম্বিসার নিজের সেই প্রেসটিজ রাখতে জানেন না। তাই বিম্বিসারকে হাসতে হয়। নিমের নির্যাস গলায় রেখে মধুর কণ্ঠে বলতে হয়, 'সে প্রশ্ন তো আপনাকেও করা যায়?'

'আমার কথা বাদ দিন। বাড়িতে আমার কে আছে বলুন?'

বিম্বিসার বলতে যাচ্ছিলেন, আমারই বা এত কে আছে? বললেন না। বেশী কথার সৃষ্টি না করাই মঙ্গল। বললেন, 'তা বটে! আচ্ছা…'

কিন্তু একবার 'আচ্ছা' বলে কি মিসেস দস্তিদারের কাছে পার পাওয়া যাবে? তিনি আর একটু মিষ্টি হাসি হেসে বলবেন না, 'আপনার গাড়ির কি হল?'

বিম্বিসারের রক-নেতা ভাগ্নেটির মারফৎ কবে যেন শুনেছিলেন মিসেস, বিম্বিসার গাড়ির জন্যে আবেদন করে রেখেছেন। অতএব দেখা হলেই গাড়ির প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। অন্য প্রসঙ্গ খুঁজে পাননা বলে? না কি গাড়ি হলে, বিম্বিসারের মত ভদ্রব্যক্তি পাড়ার গাড়িহীন মহিলাকে আসতে যেতে 'লিফ্‌ট্' দেবেন এই আশায়?

কি জন্যে কে জানে। তবে বিম্বিসারের এই প্রসঙ্গ শুনলেই ভাগ্নেটাকে কাটতে ইচ্ছে করে।

বিম্বিসার যথারীতি বলেন, 'কই?'

মিসেস আর একটু ঘনিষ্ঠ হন। গলা খাটো করেন। বলেন, 'দেবী আশ্রমের অনুভা দেবী সম্পর্কে শুনেছেন কিছু ?'

বিম্বিসার ভুরু কুঁচকে বলেন, 'কি শুনবো ? আজই তো উনি—'

'হ্যাঁ, আজ এই খানিকক্ষণ আগেই উনি আপনার বাড়িতে এসেছিলেন জানি! একটু সাবধান করিয়েই দিই, পুলিশ ওঁর পিছনে লেগেছে।'

মুহূর্তে ছোট ভাইয়ের বন্ধু প্রসাদ অধিকারীর নিপাট ভালমানুষের মত মুখটি মনে পড়ে যায় বিম্বিসারের। মিসেস দস্তিদারের কথাকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কিন্তু এও তো অসহ্য। ওই ভিতরে ভিতরে চামড়া কুঁচকে আসা মুখের ওপর উগ্র প্রসাধনের প্রলেপ বুলিয়ে, পথের মাঝে সেই মুখ নিয়ে কাছে এসে আস্তে আস্তে কথা বলা!

'মাপ করবেন।' বিম্বিসার বলেন, 'কোন মহিলা সম্পর্কে তাঁর অসাক্ষাতে আলোচনা করা…আচ্ছা!'

অনুভব করেন তাঁর পিছনে মিসেস দস্তিদারও উচ্চারণ করলেন, 'আচ্ছা!'

অকারণ একজনের উপর আর একজনের এত আক্রোশ হয় কি করে? অনুভা দেবীর সঙ্গে মিসেস দস্তিদারের তো কোনো স্বার্থ আর স্বার্থহানির সংস্পর্শ নেই! রোদ উঠছে প্রখর। বেরোলেন না, ফিরে এলেন। বাড়ি ঢুকতেই সামনে ভাগ্নে। আকর্ণ হাস্যে বলে উঠল, 'মামা 'দেবী আশ্রমে'র বোধহয় বারোটা বেজে গেল। অনুভা দেবীর নামে—'

'থাম্ অসভ্য বাঁদর!'

বলে সরে এলেন বিম্বিসার। ভাবলেন, 'যখনই তোমার কথা মনে পড়ে নীলাঞ্জনা, তখনই আমি প্লটের দুর্ভিক্ষে ভুগি।…তোমার সেই 'আশার ছবি' আমি এখানে দেখাতে আসবো কোন্ লজ্জায়?… কী করে বলবো মানুষ ক্ষয়ের পথে যাচ্ছে না, ধ্বংসের পথে যাচ্ছে

না ?···অনুভা দেবী কেবলমাত্র 'দেবী' বলেই না হয় মিসেস দস্তিদারের আক্রোশের পাত্র, কিন্তু ওই হতভাগা ছেলেটার ? ও কেন অনুভা দেবীর কোনো এক কাল্পনিক লাঞ্ছনার আশায় উল্লসিত ? আমরা কি এই রকম ছিলাম ? ওদের বয়সে ?'

তোমাকে ভুলে থাকাই ভাল নীলাঞ্জনা ! ভুলে যাওয়া ভালো তোমার অনুরোধ ! অথচ ভুলে গেলেই যন্ত্রণা পাই। মাঝে মাঝেই যেন তুমি এসে চোখের সামনে দাঁড়াও। বল, 'বিম্ব আমায় ভুলে গেলে ? মনে রাখলে না আমার অনুরোধ ?'

কতদিন ভেবেছি, তোমার কথা শুনবো না, ভাববো তুমি অন্যায় করেছিলে, তুমি অশুচি, অপবিত্র, তোমার কিসের অধিকার আদর্শের কথা বলার ? হয় না। কিছুতেই যেন তোমাকে অশুচি ভাবতে পারি না। না, সেদিন বিম্বিসার পারেনি নীলাঞ্জনাকে অশুচি ভাবতে, সুমিত্র পেরেছিল।

সুমিত্র বলেছিল, 'ওর হয়ে ওকালতি করতে এসেছ ?'

বলেছিল যখন চলে যাবে, তখন।

স্টেশনে। একদল লোকের সঙ্গে যাচ্ছিল, বিম্বিসার গিয়ে ধরল। বলল, 'সুমিত্র ভেবে দেখ, ওকে এই অবস্থায় একা অসহায় ফেলে যাচ্ছিস—'

'অসহায় ? বল কি ?' সুমিত্র বলে, 'কত সহায় ওর !' তারপর সহসা তীব্র স্বরে বলে ওঠে, 'বিম্ব, তোমার লজ্জা করছে না এভাবে ওর দায় আবার আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করতে ?'

'না হচ্ছে না !'

'তা' বটে ! আমারই ভুল ! লজ্জাই যদি থাকবে, তা হলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু ছদ্মবেশ বেশীদিন চালানো যায় না বিম্ব ! মহতের ছদ্মবেশও না ! যাক আমি তো তোমাদের পথ মসৃণ আর প্রশস্ত করে দিয়ে চলে যাচ্ছি। এবার দুজনে সুখে—'

'সুমিত্র!' গর্জে ওঠে বিম্ব। 'অসভ্যর মতো কথা বলিস না! আমি ভাবতে পারছি না এত ইতর তুই হতে পারিস!'

সুমিত্র কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'তবে কে?'

'আমিও সে কথা অহরহ ভাবছি সুমিত্র! কে? কে?'

ভেবেছে, হতাশ হয়েছে, শেষ অবধি—নীলাঞ্জনাকেই জিগ্যেস করেছে বিম্বিসার।

'নীলাঞ্জনা আমাকে বলতেই হবে, কে?'

হ্যাঁ, তখনো সুমিত্রর সেই বিরাট বাড়িটাতেই ছিল নীলাঞ্জনা। বলেছিল, 'উপায় নেই—বিম্ব, এখন তো আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে? যাকে অনেক সাধনায় ডেকে এনেছি তাকে তো পৃথিবীর আলো দেখাতে হবে! কিন্তু তবু দেখো বিম্ব, আমি থাকব না—তোমরা দেখো, ও 'মানুষ' হবে মানুষের মত মানুষ!'

'কে সেই ভার নেবে নীলাঞ্জনা?'

'ভয় নেই, তোমায় চাপাব না!' নীলাঞ্জনা হেসে উঠেছিল।

হেসে ওঠাই রোগ ছিল নীলাঞ্জনার। কিন্তু সেদিন হাসে নি।

যেদিন বিম্বিসার বলেছিল, 'কে?'

নীলাঞ্জনা গম্ভীর হয়ে বলেছিল 'ক্ষমা করো বিম্ব, ওই অনুরোধটি কোরো না!'

'কিন্তু নীলাঞ্জনা, শুধু মাটি আর সার ভাল হলেই গাছ ভাল হয় না, তা জানো?'

'জানি। ও কথা ঢের শোনা আছে, কিন্তু মানি না। মা কি কিছুই নয়?'

তারপর হঠাৎ ভারী মলিন হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'দেখতেও পাবো না, দেখাতেও পাবো না। সুমিত্র আমার সঙ্গে এত শত্রুতা করবে ভাবি নি।'

তখনই বলেছিল বিম্বিসার, 'জীবনের কি—পুনর্বাসন হতে পারে না নীলাঞ্জনা ?'

নীলাঞ্জনা বলেছিল, 'ছিঃ বিম্ব !'

তখন তো জানতো না বিম্বিসার নীলাঞ্জনা তার ভবিষ্যৎ জীবনের নক্সাটা কি করে রেখেছে। তাই বলেছিল, 'কিন্তু সুমিত্রর এই বাড়িতে থাকতে তোমার এখনো ইচ্ছে করছে নীলাঞ্জনা ?'

ও চোখ তুলে বলেছিল, 'কী করবো বিম্ব, এখন যে আমার তপস্যার দিন, প্রতীক্ষার দিন !…এখন তো দুঃখের মধ্যে অপমানের মধ্যে লাঞ্ছনার মধ্যে স্থির হয়ে থাকতেই হবে।'

তার পরের কতগুলো দিন কিভাবে কেটেছিল ভাবতে চেষ্টা করলেন বিম্বিসার।…ওই সময়টা যেন ঝাপসা ঝাপসা।…

নীলাঞ্জনা বলেছিল, 'তুমি আর এসো না বিম্ব !'

'যদি বারণ না শুনি ?'

'শুনতেই হবে বিম্ব, পায়ে পড়ি তোমার !'

তবু গিয়েছিল বিম্ব। বলেছিল, 'তোমায় কে দেখবে ?'

নীলাঞ্জনা বলেছিল, 'সেইটাই দেখতে চাই !' তবুও তার পরও গিয়েছিল বিম্ব আর দেখতে পায় নি নীলাঞ্জনাকে। বাড়িতে কারা যেন সব থাকতো, সুমিত্রর দূর দূর আত্মীয়, তারা বলেছিল, 'জানি না !…কখন চলে গেছেন কোথায় জানি না !'

তার কতদিন যেন পরে হঠাৎ একদিন সুমিত্র এলো—পাগলের চেহারা, পাগলের দৃষ্টি ! বললো, 'নীলাঞ্জনা মারা গেছে !'

নীলাঞ্জনা মারা গেছে।…সেই খবরের সুরটা এখনো যেন শুনতে পায় বিম্বিসার। হ্যাঁ, নীলাঞ্জনা মারা গেল। মারা যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পায় নি নীলাঞ্জনা।

কিন্তু কোথায় নীলাঞ্জনা? মৃত্যুর জন্যে স্থান নির্বাচন করলো কোথায় সে?

সুমিত্র কপালে ঘা মেরে বলল, 'ওরই সেই শোবার ঘরে, পালঙ্কের ওপর।'

'তোমার সেই বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু নীলাঞ্জনার সন্তান? যার জন্যে এমন করে ধ্বংস হতে হলো নীলাঞ্জনাকে?'

'কেউ জানে না!'

সুমিত্রর বাড়ির সেই লোকেরা বললো, 'কখন এসেছিল, কখন দোতলায় উঠেছিল কিছুই জানি না। বাচ্চা দেখি নি একটাই তো দেখছি!' তারা জানতো নীলাঞ্জনার কাছে সুমিত্রর বংশধর। সুমিত্রকে দোষ দিয়েছিল তারা, স্ত্রী সন্তানের দায়িত্ব ফেলে দেশের দায় নিয়ে ছোটবার জন্যে।

সুমিত্র কবে এল নোয়াখালি থেকে? আজই।

নীলাঞ্জনার চিঠি পেয়ে। চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল সে।

ছেড়ে চলে গিয়ে পর্যন্ত দারুণ যন্ত্রণায় ভুগেছে সুমিত্র, কিন্তু লজ্জায় আসতে পারে নি! রিভলবারের সেই জঘন্য হাস্যকর স্মৃতিটা তাকে পিছন থেকে টেনে ধরেছে।

তবু একথা ভাবেনি সুমিত্র। সুমিত্র জানতো আত্মহত্যায় বড় ঘৃণা নীলাঞ্জনার। কেউ আত্মহত্যা করেছে শুনলে বলতো, 'ভীরু, বোকা!' বলতো 'এত বড় পৃথিবীটার কাছে কোথাও কোনো আশা পেল না ও? এ কি হয়? এ ওর অসহিষ্ণুতা! এ ওর পৃথিবীর ওপর অবিচার!'

অথচ নীলাঞ্জনা—

বিশ্ব বলেছিল, 'তুমি! তুমিই সুমিত্র, ওকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ!'

সুমিত্র হতাশ গলায় বলেছিল, 'কিন্তু তুমিও তো ওকে বাঁচাতে পারতে বিম্ব! আমি তো বোকামী করেছি, তুমিও তাই করলে কেন?'

বিম্ব বলেছিল, 'মানুষ অঙ্কশাস্ত্র নয় সুমিত্র।'

তারপর স্বর্গ মর্ত পাতাল এক করে নীলাঞ্জনার সেই সন্তানকে খুঁজেছিল সুমিত্র।

গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেছিল, 'আমি ওকে পিতৃ-পরিচয় দেব বিম্ব, নীলাঞ্জনা যেমন করে মানুষ করতে চেয়েছিল সেইভাবে মানুষ করবো, ভোগের মধ্যে থেকে নিরাসক্ত, ঐশ্বর্যের মধ্যে বসে নিস্পৃহ সেই ভাবী কালের মানুষ যেন বুঝতে শেখে জীবনের সত্য কি। যেন আমার মত অবাস্তব কৃচ্ছ্র সাধনের পথ ধরে জীবনকে অস্বীকার করে হেরে না যায়। সে যেন তার মায়ের মত হয়।'

বিম্বিসার বলেছিল, 'নীলাঞ্জনাও হেরে গেছে সুমিত্র। নীলাঞ্জনা বুঝতে পারে নি, শুধু লক্ষ্য মহৎ হলেই হয় না লক্ষ্যের পথও মহৎ হওয়া দরকার!'

নীলাঞ্জনার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়েও মনে মনে ওই কথাই বলেছিল বিম্ব, শুধু লক্ষ্য মহৎ হলেই হয় না নীলাঞ্জনা, তার পথটাও মহৎ হওয়া দরকার।...তুমি ঘাটের সিঁড়ি পাওনি, তাই আঘাটা দিয়ে জলে নামতে গেলে, তাই পিছলে পড়লে, বাঁচতে পেলে না।... কিন্তু কোথায় গেল তোমার সেই সন্তান? কী সে? ছেলে না মেয়ে?

নীলাঞ্জনা উত্তর দেয় নি। প্রশ্নের উত্তর দেবার দায় থেকে তখন মুক্তি পেয়েছে নীলাঞ্জনা।

কিন্তু তারপর দীর্ঘদিন সুমিত্র সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছে, পায় নি।

অথচ—

অথচ কাছেই ছিল, সামনেই ছিল। শুধু জায়গাটা অভাবিত সন্দেহাতীত। যখন জানা গেল, তখন হারিয়ে গেছে। চলে গেছে সে আশ্রয় থেকে।

সুমিত্রই এসে খবর দিল, 'যখন পেলাম বিম্ব, তখন ও হারিয়ে গেছে। নীলাঞ্জনার মেয়ে—নীলাঞ্জনার বাবার কাছে ছিল।'

নীলাঞ্জনার বাবার কাছে ?

যে বাবা বিয়ের পর নীলাঞ্জনার সঙ্গে একদিনের জন্যে সম্পর্ক রাখেন নি।

'তবু সে তার বাবার কাছেই গিয়েছিল বিম্ব' সুমিত্র বলেছিল— 'সব কথা খুলে বলেছিল। বলেছিল, তোমার কাছে ছাড়া আর কোথায় যাবো সেটাই তবে বলে দাও বাবা! আর যদি মনে করো এই পৃথিবীর আলো বাতাসে ওর অধিকার নেই, সেটাও বলো জোর গলায়, স্পষ্ট করে।'

নীলাঞ্জনার বাবা বলেছিলেন, 'না সে কথা বলবোনা বলতে পারবো না। শুধু বলবো, যদি ওর ভার নিই, একাই নেবো। কথা দাও, তুমি ওর সামনে এসে দাঁড়াবে না!'

নীলাঞ্জনা অদ্ভুত একটু হেসে বলেছিল, 'কথা দিলাম বাবা!'

মেয়ের মৃত্যুর খবরও জানতে পারেননি বৃদ্ধ। কাগজে দেশকর্মী সুমিত্রর গতিবিধির সন্ধান পেতেন মাঝে মাঝে, সেই খবরের মধ্যেই নীলাঞ্জনার হিসেবটাও রাখতেন তিনি।

সুমিত্র যখন গেল, যখন বলল, নীলাঞ্জনা নেই, অনেক—অনেক দিন নেই, তখন দিশেহারা হয়ে তাকালেন।…তারপর—আস্তে বললেন, 'সে তার কথা রেখেছে, আমি—আমার কথা রাখতে পারিনি।'

বিম্ব প্রশ্ন করেছিল, 'কিন্তু নীলাঞ্জনার ছেলে ?'

'ছেলে নয় বিশ্ব, মেয়ে! সুরঞ্জনা। সুরঞ্জনা নাম রেখে গিয়েছিল নীলাঞ্জনা। আমার নামের আদ্যক্ষরটা কাজে লাগিয়ে।...সেই মেয়েকে মানুষ করছিলেন নীলাঞ্জনার বাবা আর এক নতুন আইডিয়া নিয়ে!...বললেন, সেযুগ আর এযুগ, এই দুই যুগের ছাঁচ নিয়ে আমার মেয়েকে আমি গড়তে চেয়েছিলাম সুমিত্র, ফেলিওর হয়েছি। সে কতকগুলো আলাদা আলাদা টুকরোর সমষ্টি হয়েছিল, আস্ত একটা গড়নের হয়ে ওঠেনি। তাই তার মেয়েকে সম্পূর্ণ নতুন যুগের ছাঁচে গড়তে চেয়েছিলাম সুমিত্র!...এমন করে মাঝ পথে কাজ থামিয়ে ফেলতে হবে ভাবিনি।'

বিশ্ব অসহিষ্ণু হয়েছিল।

বলেছিল, 'রাখো তোমার ওই অবাস্তব আদর্শবাদী শ্বশুরের বাক্যবিন্যাস! মেয়েটার কি হলো তাই বল।'

মেয়েটার কি হলো শুনেছিল বিশ্ব সুমিত্রর কাছে।

একটি মিশনরি স্কুলে দিয়েছিলেন তাকে নীলাঞ্জনার বাবা, স্কুলের পড়া লেখা ভাল, আদবকায়দা ভাল, রীতি নীতি ভাল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন নীলাঞ্জনার বাবা, মেয়েটা বাড়ির চাকরকে একটা কুৎসিত বিলিতি গাল দিল।...

এই আকস্মিক আঘাতে বৃদ্ধ হঠাৎ মেজাজের ভারসাম্য হারালেন, জীবনে যা না করেছেন তাই করলেন, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন তার গালে।

এ অপমান সুরঞ্জনার আট বছরের জীবনে প্রথম।

সেও জ্ঞান হারালো।

বলে উঠল, 'তুমি ছাই বিচ্ছিরি পচা! কি জন্যে মারবে তুমি আমাকে? সিস্টার রোজারিও তো রোজ বলেন ওকথা! আমরা দুষ্টুমি করলেই বলেন।'

ভদ্রলোক বললেন, ‘তোমাদের সিস্টার ভুল করেন। তুমি বলবে না আর।’

ও বললো, ‘হ্যাঁ বলবো।’

‘হ্যাঁ বলবে?’

‘বলবোই তো।’ হঠাৎ ক্ষেপে গেছে তো, তাই আরো জোর গলায় বলে, ‘কেন বলবো না?’

‘কেন বলবে না জানো?’ বৃদ্ধ কষ্টে সংযত হয়ে বলেন, ‘তোমায় ভাল হতে হবে তাই!’

সুরঞ্জনা বললো, ‘চাই না আমি ভাল হতে, কেন ভাল হবো? আমি কুড়নো মেয়ে, আমার তো মা বাপ নেই!’

নীলাঞ্জনার বাপ বলেছিলেন, ‘আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম সুমিত্র! নিশ্চিন্ত ঘুমের মাঝখানে হঠাৎ বালিশের তলা থেকে সাপ বেরোতে দেখলে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় তাকিয়ে রইলাম। তারপর নিজেকে সামলাতে সরে গেলাম! তারপর আর দেখতে পেলাম না তাকে। চলে গেছে।…রাগ করে হারিয়ে গেলো!’…

…হ্যাঁ, খুঁজেছিলাম বৈকি। আমার সাধ্যমত খুঁজেছিলাম।… তারপর মনে মনে নীলাঞ্জনাকে ডেকে বললাম, ‘নীলাঞ্জনা হেরে গেলাম। তোমার গচ্ছিত ধন রাখতে পারলাম না!’

সুমিত্র বলেছিল, ‘উনি পারেন নি, আমি খুঁজে বার করবো! নইলে নীলাঞ্জনার কাছে গিয়ে কী জবাব দেব?’

সুমিত্র খুঁজেছিল। সুমিত্র আজও খুঁজছে।

সুমিত্র প্রায় আধ পাগলা হয়ে গেছে এই বৃথা অপচয়ের ক্ষতিতে। সময়ের অপচয়, শক্তির অপচয়। তবু যেই কেউ একটা খবর এনে দেয়, অমনি সুমিত্র…

সাহিত্যিক বিম্বিসার ড্রয়ারটা খুলে একটা চিঠি বার করলেন।

সাহিত্যিককে লেখা 'পত্র সাহিত্য' নয়, নেহাৎই চিঠি। এতদিনে যে সুরঞ্জনাকে খুঁজে পাবার আশা হয়েছে, সেই কথাই জানিয়েছে সুমিত্র।

কাল এসেছে চিঠিটা।

চিঠিটা আবার তুলে রাখলেন বিম্বিসার। মনে মনে ঈষৎ হেসে বললেন, এই দশ বছরে এরকম কত আশাই তুমি পেলে সুমিত্র! তারপর কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। না, নীলাঞ্জনার গল্প নয়। অন্য গল্প। বানানো গল্প। যে গল্পের বিধাতা বিম্বিসার নিজে।...যার শেষ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না!

কিন্তু অপেক্ষার দিন বুঝি ফুরোলো। বিধাতার গল্পেরও শেষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মনে হচ্ছে। কিম্বা বিধাতার গল্প শেষ হয় না। সে শুধু ঘুড়ির মত সুতো খুলতে খুলতে এগিয়ে যায়। তাই হয়তো সুরঞ্জনাকে খুঁজে পাওয়াই এ গল্পের শেষ নয়। শুধু ওই খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অধ্যায়ের শেষ হলো।...বিম্বিসারের সেই নম্বর ওয়ান মার্কা দন্তমানিক ভাগ্নেটা ছুটে এসে খবর দিল।

'মামা, হয়ে গেল! 'দেবী আশ্রম' শেষ হয়ে গেল! খতম!... তোমার ওই অনুভা দেবীর চরণে কোটি কোটি নমস্কার মামা! নামাবলীর মধ্যে বোতল! হরিনামের ঝুলির মধ্যে রামপাখী! অ্যাঁ!...ওই আশ্রম ফাশ্রম সব বাজে কথা। ছল! মেয়েগুলোকে রেখে গোপনে—'

'তুই থামবি?' বিম্বিসার ধমকে ওঠেন 'হয়েছেটা কী?'

'বললাম তো—' ভাগ্নে গোঁজ হলো। 'পুলিশে আশ্রম বাড়ি ঘেরাও করেছিল বলিনি কাল? আজ আর কোনো কথাবার্তা নেই অনুভা দেবীর হাতে দড়ি! হি হি হি, বানের জলের সঙ্গে ঘরের জলও বেরিয়ে গেল। পাড়ার আর একটি রত্ন খসলো! আমাদের মিসেস দস্তিদারটিও...হি হি হি...ছোট মামার বন্ধু প্রসাদবাবু?

হি হি হি তিনিই তো নাটের গুরু। তিনিই তো অনুভা দেবীর স্বরূপ উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন।'

বিম্বিসার বললেন, 'তুই যাবি এঘর থেকে ?'

ফাজিল ছেলেটাকে তাড়ালেন বিম্বিসার, কিন্তু এই যুগকে কি তাড়াতে পারবেন ? যে যুগ তার অফুরন্ত রং আর অনবদ্য পালিশ নিয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠায় এক কুৎসিত কলঙ্কময় অধ্যায়ের ইতিহাস রচনা করে চলেছে ! যে যুগে মানুষকে আর কিছুতেই নির্ভয়ে বিশ্বাস করা যাবে না, নিশ্চিন্তে শ্রদ্ধা করা যাবে না। মানুষের মন থেকে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের মূল উপড়ে ফেলে দিয়ে বিকৃত এক জীবনের জয়গান করছে যে যুগ, সেই যুগের পদপ্রান্তে বসে কোন্ আশার কথা লিখবেন বিম্বিসার ? লিখবেন আদর্শের কথা ? সত্যের কথা ? কোথায় দাঁড়াবে সেই কথা ? কোন্ শিকড়ের উপর ?

ওই দিব্যদর্শন সম্ভ্রান্ত মূর্তি আশ্রম-অধ্যক্ষা অনুভা দেবী, আর ওই আহ্লাদে ঢলঢল, ন্যাকা খুকীর প্রতীক মিসেস দস্তিদার—পরস্পরের শত্রু সেজে এই যে দুটি পরম মিত্র—এই নিরীহ চেহারার একটি গৃহস্থ পাড়ার মর্মস্থলে বসে, সমাজের দেহে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করে চলেছেন, বিম্বিসার জানেন এঁরা ধরা পড়লেও মারা পড়বেন না। মারা এঁরা পড়েন না। কারণ সমাজের যত আইনরক্ষক আর ধর্মরক্ষক হর্তা-কর্তা বিধাতার দল, এঁদের কাছেই মারা পড়ে আছেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এঁরা কলায় কলায় বর্ধিত হন। হয়তো এমন অনেক বারই ধরা পড়েছেন এঁরা, কিন্তু ধরে রাখেনি কেউ। মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য খবরের কাগজের পাতায় 'একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা'র মূর্তিতে বিরাজিত হয়েই আপাতত এঁরা অস্ত যাবেন, কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবেন, আবার নতুন কোনো গগনে উদিত হবেন। গগনে গগনে নতুন মেঘের খেলা খেলবেন, নতুন সূর্যের ছটা দেখাবেন, অবশেষে কোনো

একদিন ইহলোকের খেলা শেষ করবেন। বিম্বিসাররা নিরুপায় দৃষ্টি মেলে দেখবেন, আর কলমে নতুন কালি ভরে লিখতে বসবেন, 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা…।' লিখতে বসবেন যে, 'অহম অমৃতস্যামি—।'

'মামা!' আবার এসে দাঁড়ায় ফাজিলটা, 'মামা, তোমায় ডাকছে!'

'আমায় ডাকছে?' বিম্বিসার ভুরু কোঁচকান।…'কে ডাকছে?'

'ওই যে ছোট মামার বন্ধু প্রসাদবাবু!'

প্রসাদবাবু! প্রসাদ অধিকারী! সন্ধানী পুলিশের গুপ্তচর! এই দুদিন আগেই যে একদিন এসে 'সন্ধান' নিয়ে গেছে। আবার কী কাজ তার?

ভাগ্নে পরম প্রসন্ন হাস্যে বলে, 'বুঝতে পারছ না মামা, ওদের আর কী কাজ? মানুষকে 'হ্যারাস' করাই কাজ! ওই তোমার বন্ধু সুমিত্রবাবুও তো ওখানে আটকা পড়ে আছেন—'

সুমিত্র! সুমিত্র ওখানে! হ্যাঁ সুমিত্রই আজকের নায়ক! দশবচ্ছর ধরে যে সাধনা করে চলেছে সুমিত্র, আজ তার পুরস্কার পেয়েছে! পুরস্কার? তা বৈকি! সন্ধান পেয়েছে তো সুরঞ্জনার! আর সুরঞ্জনার সূত্রেই ধরা পড়েছে অনুভা দেবীরূপী রাঘব বোয়াল।… সুরঞ্জনাও অনুভা দেবীর—দেবী আশ্রমের এক 'দেবকন্যা'! যারা দিনের বেলা মোটা শাড়ি আর মোটা ভাতের ছদ্মবেশে ঘুমিয়ে থাকে, আর রাত্রির অন্ধকারে জেগে ওঠে নাগিনী কন্যা হয়ে! কিন্তু ওরা কি ইচ্ছে করে জাগে? ওই বিষের পুঁজি কি ওদের নিজেদের?

'সুমিত্র! এই নীলাঞ্জনার মেয়ে?'

সুমিত্র বলল, 'হ্যাঁ বিশ্ব, এই নীলাঞ্জনার মেয়ে! দেখতে পাচ্ছোনা সেই নাক, সেই চোখ, সেই ভুরুর ভঙ্গিমা! শুধু ঠোঁট দুটো বদলে গেছে। এই আঠারো বছর বয়সেই সিগারেট খেয়ে আর মদ খেয়ে ঠোঁটের গড়নটা বিবর্ণ কুৎসিত করে ফেলেছে! আঠারো বছরের মেয়ে কি রকম কথা কয় দেখিস। অনুভা দেবীর ভাঁড়ারে ওইটিই বোধহয় সেরা মাল। দাদামশাইয়ের কাছ থেকে রাগ করে পালিয়ে গিয়েছিল স্কুলের টীচারের কাছে।···তখন অনুভা দেবী নাম ছিলনা সেই টীচারের, অন্য নাম ছিল, ছিল অন্য রং।

কিন্তু সুরঞ্জনাকে তিনি লুফে নিয়েছিলেন, তারপর সেই মেয়েটার রূপান্তর ঘটিয়েছেন আস্তে আস্তে।

গতকাল রাত বারোটার সময় টলতে টলতে একটা হোটেল থেকে বেরোচ্ছিল সুরঞ্জনা, ঝগড়া করে সঙ্গীর গায়ে বোতল ছুঁড়ে মেরে। পুলিশের হাতে অতএব—'

সুরঞ্জনা উদ্ধারের গোড়ার ইতিহাস এই! সুমিত্র স্বীকার করেছে।

পুলিশের কাছে সোজা দাঁড়িয়ে স্পষ্ট গলায় বলেছে, 'এ আমার মেয়ে। আট বছর বয়সে হারিয়ে গিয়েছিল!'

প্রমাণ?

তা' দেখাবে প্রমাণ। নীলাঞ্জনার ফটো আছে বুক পকেটে, সেই এক প্রাথমিক প্রমাণ!···তারপর আরো দেখাবে।

কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়া মেয়েটাও সোজা দাঁড়িয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, 'আপনি যদি আমার বাবা তো, আমি কুড়নো মেয়ে হিসেবে মানুষ হয়েছি কেন?'

'অনেক কারণ থাকতে পারে, পরে শুনবে, সব বলবো।'

'না, আমাকে এখনি বলতে হবে। এমন কি কারণ? মা সন্তানকে ফেলে দিচ্ছে, বিলিয়ে দিচ্ছে, শেষ করে দিচ্ছে, এ দৃশ্য

দেখেছি। অনুভা দেবীর সঙ্গে দশ বছর আছি আমি, অনেক অদ্ভুত দেখিয়েছেন তিনি আমায়। কিন্তু বাবা? যে বাবা পরিচয় স্বীকার করতে রাজী হয়, সে কেন ফেলে দেবে?'

বিম্বিসার অবাক হয়ে দেখছিলেন, এতটুকু মেয়ের এই তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট কথা। যে কুশ্রীতার মধ্যে কাটাতে হয়েছে তাকে এই দীর্ঘকাল, সে কুশ্রীতা কি তাকে সাহস দেবার? বুকের পাটা জোগাবার? ওই তো আরো মেয়েরা।...পুলিশের ভ্যানে উঠে কাঁদছে আর কাঁদছে।...অবশ্য সুরঞ্জনাকেও যেতে হবে ওই ভ্যানে, কিন্তু সুরঞ্জনা আবার ঘরে ফিরতে পাবে বলেই কি কাঁদছে না? কিন্তু সেই ঘরের লোভে তো লালায়িত হয়ে নত হচ্ছে না সুরঞ্জনা। বিনীত হচ্ছে না। নীলাঞ্জনার মেয়ে উদ্ধত হয়েছে। নীলাঞ্জনার মেয়ে নির্লজ্জ হয়েছে। তবু ও যখন সোজা দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, ওকে নীলাঞ্জনার মেয়ে বলে চিনতে ভুল হল না। ও ওর মার মত আবেগের পৃথিবীর নয়, বাস্তব পৃথিবীর। তবু ও ওর সেই মার মেয়ে! পৃথিবী ওর সামনে নিজের নিরাবরণ মূর্তিটা দেখিয়েছে বলে ও ক্ষিপ্ত, অসহিষ্ণু, উদ্ধত। যে পৃথিবী ওকে মাটিতে আছড়ে আছড়ে মাটি কী বস্তু জানিয়েছে, সে পৃথিবীকে ও বিশ্বাস করবে কেন?

করবে না।

তাই রূঢ় হাসি হেসে বলেছে, 'হঠাৎ এ রকম একটা উচ্ছন্ন যাওয়া অসভ্য মেয়ের 'বাবা' সাজবার শখ কেন? আপনারও কোনো মঠ মন্দির আছে নাকি?'

মাথা হেঁট করতে হয়েছে উপস্থিত সবাইকে। ও ফের বলেছে, 'না আমি যাব না! এই এতগুলো মেয়ের যা দশা হবে, আমারও তাই হবে।'

'ওদের সকলকেই ওদের নিজেদের জায়গায় ফিরিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে সুরঞ্জনা!'

সুরঞ্জনা হেসে উঠেছিল।

'নিজেদের জায়গা? ওঃ! সে ওরা নিজেরাই ঠিক করে নেবে, তার জন্যে কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'না সুরঞ্জনা ভুল করছো, ওদের মা বাপের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে!'

মেয়েটা লহরে লহরে হেসে উঠেছিল।

বলেছিল, 'আপনি বুঝি আশা করছেন ওদের সকলেরই ঘরে ঘরে আপনার মত এমন একটি স্নেহময় পিতা ঘরে নেবার জন্যে কোল পেতে বসে আছেন?'

পুলিশে তাড়া লাগিয়েছিল। 'ভ্যানে' উঠে পড়েছিল ওরা। তবু সুমিত্র জানে সুমিত্র ওকে ঘরে নিয়ে আসতে পারবে। এই দশ বছর ধরে যত খুঁজেছে সুমিত্র, তার ইতিহাস আছে পুলিশের ঘরে। সেই ইতিহাস নীলাঞ্জনার মেয়ের মন গলাতে পারবে।

নীলাঞ্জনা তুমি আশাবাদী।

তাই তুমি অনেক আশা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলে! সে পরীক্ষা মস্ত একটা ভুল দিয়ে সুরু।...

তবু তার কোথাও কোনখানে মস্ত একটা সত্য ছিল। যে সত্যের শক্তিতে সুমিত্র পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকার করতে পারে, সিগারেট খেয়ে খেয়ে ঠোঁট বেঁকে যাওয়া এই আঠারো বছরের মেয়েটা আমার নিজের মেয়ে! সুমিত্রর হাতটা বিম্বিসারের হাতটাকে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরা আছে!...সুমিত্রর চেহারায় আজও যেন অপরিণত কৈশোরের উদ্‌ভ্রান্ত ছাপ। সমবয়সী বিম্বিসারের কাছে অনেক ছোট দেখাচ্ছে ওকে!

সুমিত্র আস্তে বলে, 'বিম্ব, সেদিন তোমায় সন্দেহ করেছিলাম! যদি তুমি আমার সেই সন্দেহকে সত্যি করতে বেঁচে যেতাম!'

বিম্বিসার বলেন, 'ছি সুমিত্র!'

'হয়তো ছি! তবু না ভেবে পারছি না, চিরদিনই না ভেবে

পারবো না, সুরঞ্জনা কোথা থেকে এল! না ভেবে পারবো না, নীলাঞ্জনার মেয়ে এমন হল কেন!'

'পরিবেশকে ভুলে যেওনা সুমিত্র! পরিবেশই মানুষের ছাঁচের মাটি!'

'আচ্ছা বিম্ব! আঠারো বছর বয়েস পার হলে যে সাবালিকা বলে ধার্য করা হয়, সে কি ওই ছাঁচের কাজ শেষ হয়ে যায় বলে? আর বদলায় না গড়ন?'

বিম্বিসার ওর ধরা হাতটায় একটু হাতের চাপ দেন। বলেন, 'আশা ছাড়লে চলবে কেন সুমিত্র?'

হ্যাঁ, সেই আশার কথাই বলে বসেন বিম্বিসার। কে জানে জ্ঞাতসারে, না অজ্ঞাতসারে। নীলাঞ্জনার সেই নীল কাঁচের মত আলো আলো চোখ দুটো কি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে? সে কি করুণ মিনতি জানাচ্ছে, 'মানুষ ধ্বংস হচ্ছে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, এই খবরটা পৃথিবীকে দেবার জন্যেই কি কলম ধরেছ বিম্ব?'

না এ আশা দেওয়া শুধু চিরাচরিত সংস্কারের প্রতিফলন?

'ওকে কি তুমি আবার স্কুলে দেবে সুমিত্র?'

'না!' সুমিত্র বলে, 'স্কুলে দেব না। ছোট ছোট বাচ্ছাদের সঙ্গে পড়তে হবে তা'হলে ওকে। ও লজ্জিত হবে তাতে, ওর অহমিকা ক্ষুণ্ণ হবে, হয়তো আবার পালাতে চাইবে! ওকে আমি নিজে পড়াবো।'

তারপর সুমিত্র হঠাৎ বিচলিত হল। বললো, 'বিম্ব, এমন হওয়াই তো স্বাভাবিক, ওকে যেমন করেই রাখতে চাই, ও আবার পালাবে!...যে বাঘিনী রক্তের আস্বাদ পেয়েছে, সে কি দুধ খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে?'

বিম্বিসার আস্তে বলেন, 'আমরা ভাববো তা' হবে না। সেইটাই তো আশার ইতিহাস সুমিত্র! সেই তো আশার স্বরূপ!...

বেহুলার গল্পকে আমরা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে শিখবো বলেই তো ওই গল্পটার সৃষ্টি!…লখিন্দরের শবদেহটাকে ফেলে দিলে চলবে কেন? তাকে নিয়ে একদিন স্বর্গে পৌঁছতেই হবে এই লক্ষ্য নিয়েই বেহুলাকে ঘুরতে হবে ঘাটে ঘাটে!…সুরঞ্জনার জন্মের মূলে যে ভুলই থাক, তবু সুরঞ্জনা নীলাঞ্জনার মেয়ে একথা ভুলবো কেন?…ওর জীবনের এই দশটা বছরই সব, সেই কথাটাই ভুলতে হবে!'…

আগুনের ডেলাটা সারাদিন জ্বলতে জ্বলতে ক্রমশ লাল হয়ে আসছে, গাঢ় লাল হয়ে আসছে ওর অবসন্ন হৃৎপিণ্ডটা। ওটাই বিদায় সঙ্কেত, মৃত্যুর আগের নাড়ির স্তিমিত গতির মতো। বোঝা যাচ্ছে এর পর ওই লালচে আভাটা দ্রুত আরো মরা মরা হয়ে আসবে, তারপর সহসা নিভে যাবে।

নিভে যাবে তবু তারও খানিকক্ষণ পর অবধি দিনের চিতার সেই মৃত্যু বিবর্ণ রক্তাভা আকাশের গায়ে ছড়িয়ে থাকবে একটা বিষাদ সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো। আকাশকে তখন শোকাচ্ছন্ন রমণীর মতো দেখতে লাগবে, দেখে ভয় ভয় করবে।

আকাশ প্রতিদিন বহন করছে জন্ম-মৃত্যু জরা-যৌবনের এই চিরন্তন লীলা।

আশ্চর্য, ও কোনদিন ক্লান্ত হয়ে ভাবে না বড় একঘেয়ে লাগছে, আজ যদি অন্যরকম হতো!

যেমন একঘেয়ে লাগতে চন্দ্রাবতী ভাবছেন, আজ যদি অন্যরকম হতো!

সূর্যাস্তের আকাশের দিকে কি এর আগে কোনদিন তাকাননি চন্দ্রাবতী? শুধু আজই তাকালেন, মিস্টার যোশী ওদিকে তাকালেন বলে?

কিন্তু মিস্টার যোশী কি শুধুই অস্তমিত সূর্যের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন? অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন না চন্দ্রাবতীর অস্তমিত যৌবনের দিকে?

না। একথা মনে করেন না চন্দ্রাবতী, যোশী সাহেব এটা জেনে-

বুঝে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছেন। সরল সাদাসিধে প্রৌঢ় মানুষটি, বাঙালী পাড়ায় অনেকদিন বাস করছেন, বাংলা কথা বলতে শিখেছেন, কিন্তু বাঙালী মনের খুঁটিনাটি তথ্যের খবর রাখতে শেখেননি, তাই তিনি নিজের চাইতে বয়সে বেশ দু-চার বছরের ছোট চন্দ্রাবতীকে দিদি না বলে ছাড়েন না।

এবং বলতে দ্বিধা করেন না, 'আর দিদি, আমাদের দিনও তো অমনি ফুরিয়ে এল! এখন ওই আকাশটার মতো আঁধার হতে বসেছি।'

আমাদের বলে চন্দ্রাবতীকে নিজের দলে টেনে আর অস্তমিত সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে তিনি যে কোথায় আঘাত হেনে বসলেন, সে খেয়াল করলেন না যোশী সাহেব, বরং খুব একটা উঁচুদরের দার্শনিক মনোভাব বাংলায় প্রকাশ করতে পেরেছেন ভেবে আত্মগর্বে পুলকিত হলেন। আরো পুলকিত হলেন চন্দ্রাবতীকে একটু সহানুভূতির স্পর্শ দিতে পারলেন মনে করে।

কিন্তু চন্দ্রাবতী বুদ্ধিমতী বয়সের সঙ্কেতে চমকে উঠলেন, কি আহত হলেন, বোঝা গেল না, ঈষৎ হেসেই বললেন, 'তা তো সত্যি।'

যোশী সাহেব এতে আরো উদ্বেলিত হলেন, কথায় আরো দার্শনিক সুর লাগিয়ে বললেন, 'সাঁঝের আকাশের বিউটি দেখে আগে আনন্দ লাগত দিদি, আজকাল দুঃখ লাগে।'

চন্দ্রাবতী নিতান্তই কথা বলতে হওয়ার দায়ে বলেন, 'দুঃখ লাগে? কেন?'

'কেন? আপনি বলছেন কি দিদি? দুঃখ লাগবে না? মনে হয় না—এই তো আমারও তো অমনি ফুরিয়ে গেল সব রং, সব আলো, সব তেজ, এরপর শুধু আঁধার! কোন্ ফাঁকে কখন যে সব ফিনিস হয়ে গেল! হঠাৎ দেখি কি দিন শেষ! আপনার মনে হয় না এ কথা?'

যোশী সাহেবের মুখটা উদাস-উদাস দেখায়।

বাংলা বলতে শিখেছেন যোশী সাহেব, বাংলা বলার সুরটা রপ্ত করতে পারেননি। আর ক-জনই বা তা পারে? অবাঙালীর মুখের বাংলা অনেকটা শিশুর মুখের ভাঙা-ভাঙা কথার মতো অপটু, আর অপটু বলেই সরল আর মিষ্টি।

এই কথাগুলি যদি যোশী সাহেবের বয়সের কোন বাঙালী বিপত্নীক প্রৌঢ় এ হেন পরিবেশে, এ হেন দার্শনিক সুরে, উচ্চারণ করত, শুনে নির্ঘাৎ গা জ্বলে যেত। যোশী সাহেবের প্রতি শুধু একটু অনুকম্পা আসে। মনে হয় আহা বেচারা, এই জোলো ভাবালুতা-টুকুকে কতখানিই না মনে করছে!

হাসি এল, তবু ভদ্রতার খাতিরে সায় দিতে হয়, বলতেই হয়, 'ঠিকই বলেছেন মিস্টার যোশী, বেশির ভাগ মানুষের মধ্যেই তো ওই আক্ষেপ! জীবনে অনেক কিছু করলাম—এ আর ক-জন বলতে পারে?'

সায় না দিয়ে উপায় কি? বেচারা বিপত্নীক প্রৌঢ়, নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার শূন্যতার দংশনে 'ঘোষ ম্যানসনের' এই চব্বিশটা ফ্লাটের দরজায় দরজায় ঘোরেন, এবং অধিকাংশ দরজাতেই দেঁতো হাসি ছাড়া আর কিছুই জোটে না।

চন্দ্রাবতী সেটা জানেন, এবং এও জানেন লোকটা অভ্যর্থনার সেই হাসিকেই আন্তরিক হাসি ভেবে বিগলিত হয়।

লোকটার জন্যে মায়া হয় চন্দ্রাবতীর, অথচ অন্যদেরও দোষ দিতে পারেন না। ও রকম একটা 'ডাল্' লোককে নিত্য সহ্য করা শক্ত বৈকি। যোশী সাহেব যদি মজলিস জমিয়ে গল্প করতে জানত, যদি দু-চার পেগ টানতে পারত, যদি সত্যের সঙ্গে মিথ্যার রং মিশিয়ে ওর কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী পরিবেশন করতে পারত, নিশ্চয় এই প্রগতিশীল পাড়ার আধুনিক ফ্ল্যাটের অধিবাসীদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারত, কিন্তু যোশী সাহেব তা

নয়। যোশী সাহেব নিরামিষাশী। মদ্যপান তো দূরের কথা, ধূমপানের দিকে পর্যন্ত যান না। বিশ্বাস হয় না একদা লোকটা একটা উচ্ছৃঙ্খল ফরেস্ট অফিসার ছিল।

অথচ ছিল তাই, শুনেছেন চন্দ্রাবতী।

হুঁদে স্বভাব ছিল নাকি লোকটার, বোতলকে বোতল গলায় ঢালত, আস্ত একটা মুরগী না হলে ওর ডিনার হতো না।…মোটর-বাইকে চাপলে ওর জ্ঞান থাকত না—পৃথিবীর মাটিতে ছুটছে, না মহাশূন্যের পথে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছে! আরো অনেক কিছু বর্বরতা ছিল যোশী সাহেবের।

কিন্তু ওর স্ত্রী পদ্মা ছিল একেবারে অন্য ধাতুর। স্বামীকে সে ভয় করত, ঘৃণা করত! কখনও চোখের জলে ভিজে স্বামীকে এই বন্য বর্বরতা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে, কখনও দিনের পর দিন কাঠের পুতুলের মতো কঠিন হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিঃশব্দে সংসার করেছে।

যোশী সাহেবের অবশ্য তখন খুব কিছু এসে যেত না তাতে, অন্য আকর্ষণ ছিল তখন যোশী সাহেবের। আদিবাসীদের উদ্দাম যৌবনের মধ্যে আশ্চর্য উল্লাস পেতেন তিনি। কতদিন রাত্রে বেরিয়ে গিয়ে জঙ্গলের ধারে ওদের সঙ্গে ভিড়ে আগুনের চারধারে ঘুরে ঘুরে মাদল বাজিয়ে নেচেছেন, তাড়ি খেয়েছেন, এবং সে রাত্রে আর ফিরে আসেননি।

তবু তখন পদ্মা ভয়ঙ্কর একটা কিছু করেনি কোনদিন। ওই নিঃশব্দ ভাবশূন্য মুখে ঘুরে বেড়াত, জিগ্যেস করত, যোশী সাহেব চা খাবেন না কফি খাবেন। তারপর রান্না করতে বসত যোশী সাহেবের মনের মতো করে। কিন্তু সেই পদ্মারও একদিন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

একদিন—

সেদিন সন্ধ্যায় যখন যোশী সাহেব বেরোবার জন্যে প্রস্তুত, পদ্মা

হঠাৎ যোশী সাহেবকে ডেকে বলেছিল, 'আজ তুমি কোথাও বেরোতে পাবে না।'

যোশী সাহেব হেসে বলেছিলেন, 'সে কি, আজ যে আমার এস. ডি. ও. মিস্টার সিনহার সঙ্গে শিকারে যাবার ঠিক রয়েছে। যেমন তেমন শিকার নয়, বাঘ শিকার!'

পদ্মার মুখ ঘৃণায় কালো হয়ে গিয়েছিল, যেটাকে না কি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না যোশী সাহেব। ওর ওই হঠাৎ কালো হয়ে যাওয়া মুখটা দেখলেই নিজেকে ভারি হেয় আর ভারি ছোট মনে হতো যোশী সাহেবের, আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই আহত পৌরুষ যেন আক্রোশপরায়ণ হয়ে অধিকতর বর্বরতায় মেতে উঠতে চাইত।

তাই পদ্মা যখন ঘৃণায় মুখ কালো করে বলে উঠল, 'বাঘ শিকার! ওঃ বীরত্ব! হতভাগা মুণ্ডারা মাচা বেঁধে তোমাদের জন্যে নিরাপদ সিংহাসন খাড়া করে বাঘকে ঠেঙিয়ে মাচার নীচে এনে দেবে, আর তোমরা ওপর থেকে বন্দুক ছুঁড়বে, এই তো!'

যোশী সাহেবের রক্ত গরম হয়ে উঠল। বলে উঠলেন, 'ওঃ বড্ড যে বোলচাল! তোমার বাপ-দাদা ওটুকু বীরত্বও করেছে কোনদিন?'

পদ্মা ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলেছিল, 'আমার বাপ-দাদা তোমার মতো কাপুরুষ ছিল না, তারা অসহায় বনের পশুকে দূর থেকে গুলি ছুঁড়ে মেরে বাহাদুরী বোধ করাকে ঘৃণা করত! তারা তোমায় ঘৃণা করে, বুঝলে? তারা তোমায় বনের একটা জানোয়ারের সামিল মনে করে।'

যোশী সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। যোশী সাহেব ইতিপূর্বে আর কখনও পদ্মার মুখে এমন স্পষ্ট ধিক্কারের ভাষা শোনেননি। তাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন একবার। তারপর তার রক্ত জ্বলে

উঠেছিল। বলেছিলেন, 'শুধু তোমার বাপ-দাদা কেন, তুমিও নিশ্চয় তাই মনে কর?'

পদ্মা অদ্ভুত একটা হাসির সঙ্গে বলেছিল, 'মিথ্যে নয়। সেই সঙ্গে নিজেকেও একটা জানোয়ার ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না।'

'ওঃ! তাই নাকি! তা নিজের সম্পর্কে এ ধারণার হেতু?'

পদ্মা বলেছিল, 'হেতুটা ধরতে পারছ না? না পারবার তো কারণ নেই! জানোয়ার না হয়ে গেলে এখানে পড়ে আছি কি করে? তোমার ভাত রাঁধছি, আর তোমার ভাত খাচ্ছি কি করে? তোমার বিছানায় ধরা দিয়ে পরদিন আবার বেঁচে থাকছি কি করে?'

যোশী সাহেবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গিয়েছিল, তবু যোশী সাহেব পদ্মার মুখের এই সব কথায় অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাই কথা বলতে সময় লেগেছিল তাঁর।

সামলে গিয়ে হেসে উঠে বলেছিলেন, 'ভুলে যেও না আমার হাতে বন্দুক রয়েছে। লোড করা বন্দুক।'

পদ্মা কেঁপে ওঠেনি, পদ্মা তেমনি হেসে উঠে বলেছিল, 'সেই জন্যেই তো এখন চেষ্টা করে দেখছি তাতিয়ে তুলতে পারি কি না। দেখছি, ভিতরে এক ফোঁটাও সত্যি বীরত্ব আছে কি না।'

যোশী সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'সত্যি! খুন হবার এত ইচ্ছে!'

'সত্যি! বিশ্বাস কর, বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে।'

যোশী সাহেব তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন, 'খুন হবার ইচ্ছে নিয়ে যে এগিয়ে আসে, তাকে শিকার করে আর সুখ কি? যে বাঁচবার জন্যে আকুল হয়ে ছুটোছুটি করবে, তাকে মারতে পারলে তবে না সুখ!'

'ইস্!' পদ্মা আক্ষেপ করেছিল, 'তবে আর তোমার হাতে শিকার হওয়া হলো না আমার।'

'তাই দেখছি।' বলে গটগট করে বেরিয়ে পড়েছিলেন যোশী সাহেব।

পদ্মা বলেছিল পিছু পিছু এসে, 'তোমার বাইকের পিছনে টিফিন ক্যারিয়ারে রাত্রের খাবারটা রইল, খেয়ো ঠিক সময়ে। দু-জনের মতো আছে। বন্ধুকেও দিও।'

'অনেক ধন্যবাদ!' বলে চলে গিয়েছিলেন যোশী সাহেব, আর ফিরে তাকাননি। দেখেননি পদ্মার মুখটা তখন কি রকম দেখাচ্ছে। অভিমানে লালচে, না ঘৃণায় কালো!

'আচ্ছা অভিমানটা তো ভালবাসা থেকেই আসে?' চন্দ্রাবতীকেই প্রশ্ন করেছিলেন যোশী সাহেব, 'তবে ঘৃণাটা কোথায় থাকে?'

চন্দ্রাবতী মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'দুটোই পাশাপাশি থাকতে পারে মিস্টার যোশী! মেয়েদের হৃদয়-রহস্য বড় জটিল।'

'মেয়েদের হৃদয়-রহস্য বড় জটিল! ঠিক বলেছেন দিদি!' যোশী সাহেব বলেছিলেন মাথা নেড়ে, 'ঠিক কথা! তাই সে দিনে অমন ভয়ানক কাণ্ড করে বসল পদ্মা!'

হ্যাঁ, সেই রাত্রে একটা ভয়ানক কাণ্ডই করে বসল পদ্মা। কেরোসিনের টিনটা গায়ে উপুড় করে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

রান্নাঘরের মধ্যে খিল লাগিয়ে দিয়েছিল আগে।

ধোঁয়া আর আগুন দেখে দাইটা আর চাকরটা ঘুম ভেঙে উঠে এসে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারেনি, তারপর মেমসাহেবের ঘর খোলা আর খালি দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল।

কিন্তু দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে যে সময়টা লেগেছিল, সেটা কম নয়। ততক্ষণে পদ্মার দেহটা পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল, পদ্মার

গায়ে যে জামা কাপড় ছিল, তা আর বোঝা যাচ্ছিল না। ওরা একটা চাদর চাপা দিয়ে দিয়েছিল।

পরদিন সকালে যোশী সাহেব এসে দেখলেন সেই দৃশ্য।

''কার্ট্রিজ'গুলো সমস্ত খতম হয়ে গিয়েছিল দিদি! তাই এখন এই মিস্টার যোশীকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা! না হলে হয়তো সেইখানেই দুটো মৃতদেহ শোয়ানো থাকতো!'

না। পরে আর হয় না। পরে শুধু আমূল বদলে গেলেন যোশী সাহেব। নেশা ছাড়লেন, মাছ মাংস ছাড়লেন, শিকার ছাড়লেন, চাকরি ছাড়লেন। অসময়ে রিটায়ার করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ালেন, তারপর কলকাতায় এসে বাঙালীপাড়ায় বসবাস সুরু করলেন।

'বাঙালীর প্রাণে দরদ আছে দিদি, সেই জন্যে বাঙালীর মধ্যে থাকতে ভালবাসি।' বলেছিলেন যোশী সাহেব, 'প্রথম এসে আগের ওখানে মনটা বসে গিয়েছিল। বাড়িওয়ালা বাড়ি বিক্রি করে দিল, টেনান্টদের উঠে যেতে বলল—'

চন্দ্রাবতীর ফ্ল্যাটের ঠিক মুখোমুখি ফ্ল্যাটটাই যোশী সাহেবের, যেদিন এসেছিলেন তিনি, চন্দ্রাবতী কৌতূহলী হয়ে ভেবেছিলেন স্ত্রী পুত্র পরিবার কিছু নেই দেখছি লোকটার। ব্যাচিলার? না কি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে একা কলকাতায়—না কি বাসা ঠিক করে পরিবার আনবে।

কিন্তু বেশিক্ষণ কৌতূহল দংশন সহ্য করতে হলো না। চন্দ্রাবতী সিঁড়ি দিয়ে নামবেন, সামনেই দেখা।

ব্যাস, দু-হাত জোড় করে আলাপ জমাতে সুরু করে দিলেন ভদ্রলোক। 'দিদি' ডাকতে সুরু করলেন। এবং চন্দ্রাবতীর মতো এমন মহিয়সী মহিলাকে এমন নিকটতম প্রতিবেশিনী পেয়ে যে তিনি ধন্য হয়ে গেছেন, তা বার বার করে জানিয়ে, এবং আবার দেখা হবে এই আশ্বাস দিয়ে তবে নীচে নামতে দিলেন চন্দ্রাবতীকে।

চরম অস্বস্তি আর বিরক্তি নিয়ে সেদিন বাজারের কেনা-কাটা সেরে বাড়ি ফিরলেন চন্দ্রাবতী, এবং ভয়ে ভয়েই সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন পাছে আবার আক্রমিত হন। তা তখনই অবশ্য হননি, কিন্তু হলেন, সেই সন্ধ্যাতেই হলেন।

দরজায় 'বেল' বাজল। এবং দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই হাস্য-রঞ্জিত একখানি মুখ বলে উঠল, 'মিস্টারের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম দিদি!'

চন্দ্রাবতী কি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, মিস্টার বলতে কেউ নেই এ বাসায়। না কি বলেছিলেন, আমি একা মহিলা থাকি, আমার ফ্ল্যাটে এসে অপরিচিত আপনি আলাপ জমাতে বসেন এটা অশোভন।

না। এমন অসভ্য কথা বলে উঠতে পারেননি চন্দ্রাবতী। শুধু আস্তে বলেছিলেন, 'আর কেউ নেই এ ফ্ল্যাটে।'

যোশী সাহেব তাতে নিবৃত্ত হননি। হয়তো ভেবেছিলেন এই না থাকাটা সাময়িক, তাই মহোৎসাহে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে আমি বসছি।' বলে প্রায় দরজা ঠেলেই ঢুকে পড়েছিলেন। অগত্যাই সরে দাঁড়াতে হয়েছিল চন্দ্রাবতীকে।

যোশী সাহেব যখন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নড়লেন না তখন চা-ও দিতে হয়েছিল। চন্দ্রাবতীর রাতদিনের ঝি হেনা বলেছিল, 'আজই তো ওই বুড়োটা চোদ্দ নম্বরে এল, না। তা ওই 'এণ্ডু মেণ্ডু' বুড়ো কি আপনার চেনা ছিল না কি?'

ছিল, চন্দ্রাবতী তাড়া দিয়েছিলেন। তুই চা-টা কর তো তাড়াতাড়ি।

তারপর?

তারপর বোঝা গেল তাড়াতাড়ি করবার বিশেষ দরকার ছিল না। আরো বহুক্ষণ থাকলেন ভদ্রলোক, বাড়িতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই বলে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করলেন না। আবার আসবেন,

এবং চন্দ্রাবতীর সঙ্গে আলাপ হয়ে সে কি পরিমাণ আনন্দিত হলেন, তা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

তদবধি রোজই আক্রমিত হচ্ছেন চন্দ্রাবতী। একবার নয়, একাধিক বার।

সিঁড়িতে দেখা হলে তো কথাই নেই ফ্ল্যাটে এসেও হানা। আরো তেইশটা ফ্ল্যাট আছে এই বড় ফ্ল্যাট বাড়িটায়, ঘোষী সাহেবের সঙ্গে প্রায় সকলেরই চেনা হয়ে গেছে এবং প্রায় সব ফ্ল্যাটেই পদার্পণ করে থাকেন তিনি। কিন্তু চন্দ্রাবতী যে একেবারে মুখোমুখি। তাই চন্দ্রাবতীকে প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখোমুখি বসে 'দিদি' ডাকের সঙ্গে জোলো জোলো কথা শুনতে হয়।

হ্যাঁ, মুখোমুখি! মুখোমুখি বসা ছাড়া উপায় নেই।

এই দু-ঘরা ফ্ল্যাটগুলোয় বারান্দা নামক যে বস্তুটা আছে সেটাকে বারান্দার বাপ্প বললেই ভাল হয়। একখানি ইজিচেয়ার পেতে একজন আকাশ দেখো, এইটুকু দাক্ষিণ্য।

সেই দাক্ষিণ্যটুকুর উপরই দু-খানা হাল্কা বেতের চেয়ার পেতে রাখতে হয়েছে চন্দ্রাবতীকে। বলতে কি ঘোষী সাহেবের জন্যেই হয়েছে। কেন কে জানে চন্দ্রাবতীর কাছে এলেই সুখ-দুঃখের কথায় উচ্ছল হয়ে ওঠেন ঘোষী সাহেব, সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, চন্দ্রাবতী তাই বসবার ঘর থেকে সরে এসে এইখানে বসবার ঠাঁই করে নিয়েছেন।

তবু তো বাইরে খোলা। তবু তো আকাশের নীচে।

তবু তো পাশাপাশি আরো সারি সারি ওই 'দেড় কুটিয়া' বারান্দা আছে, যেখান থেকে দেখা যায়। দু-ঘণ্টা যদি এখানে কাটিয়ে যান ঘোষী সাহেব, সেই দু-ঘণ্টাই কারো না কারো চোখের উপর থাকবেন তাঁরা।

নইলে কেউ যদি দেখে রাখে ঘোষী সাহেব ফ্ল্যাটে ঢুকলেন এবং ঘণ্টা দু-তিন পরে বেরোলেন, সেই দেখাটা কল্পনায় কত না পল্লবিত

হয়ে উঠতে পারে। দেয়ালের আড়াল থেকে সেই কল্পনার চক্ষু সহস্রচক্ষুর ভূমিকা নেবে তার সন্দেহ নেই।

চন্দ্রাবতীর বয়েস সাতচল্লিশ? যোশী সাহেব তাঁকে দিদি ডাকেন?

হুঁঃ তাতে আর লোকচক্ষু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে না।

চন্দ্রাবতী যে একা থাকেন, স্বামী নেই তাঁর, এটা তো আর কেউ ভুলতে পারবে না। স্বামী থাকলেই বড় রেয়াৎ করে লোকে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে একটা পরপুরুষের সঙ্গে বসে দীর্ঘক্ষণ গল্প করছেন দেখলে ছেড়ে কথা কইবে না কেউ। হলোই বা ফ্ল্যাট বাড়ি, হলোই বা কারুর অধঃপতনে কারুর এসে যায় না। মানুষের সমাজ তো বটে।

কিম্বা হয়তো সবটাই চন্দ্রাবতীর মনের ভ্রম। তাঁর নিজের মানসিক অস্বস্তিই লোকচক্ষুর অনুভূতি হয়ে তাঁকে পিঠে ছাট মারতে থাকে। আসলে সমাজ বলে কিছুই নেই।

তবে ছিল একদা। সমাজ এবং লোকচক্ষুকে দেখেছেন চন্দ্রাবতী বাল্যে যৌবনে, তাই সেই অস্পষ্ট অনুভূতিটা—

কিন্তু চন্দ্রাবতীর যৌবনটা কি সত্যিই অতীত হয়ে গেছে? আগুনের ডেলাটা অনর্থক জ্বলে জ্বলে অবশেষে পশ্চিমের ওই আকাশটার মতো অন্ধকার হয়ে গেছে? চন্দ্রাবতীর বহুবিধ প্রসাধন দ্রব্য আর বহুবিধ কলাকৌশল তাকে ধরে রাখতে পারেনি?

প্রথম যেদিন যোশী সাহেব সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে 'দিদি' বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, রাগে বিরক্তিতে হাড় জ্বলে গিয়েছিল চন্দ্রাবতীর। আর বাজারের কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই এসেছিলেন আলমারির পাল্লার বড় আরশীর সামনে।

কেন? কেন ওই বুড়ো লোকটা চন্দ্রাবতীকে খামোকা দিদি

বলতে সাহসী হলো ? চন্দ্রাবতীকে দেখে কি খুব বয়স্কা মনে হলো ওর ?

নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন চন্দ্রাবতী, মুখের রেখায় রেখায় যেন একটু ক্লান্তি আর শিথিলতা আবিষ্কার করলেন, আর সেটাকেই দায়ী করলেন।

সেই অবস্থাতেই বিলিতি একটা রূপচর্চার ম্যাগাজিন ওলটাতে বসলেন। চন্দ্রাবতীকে বুড়ো দেখাবে, এ চন্দ্রাবতীর কাছে অসহ্য। চন্দ্রাবতী বরং ঘরের মধ্যে একবেলা খেয়ে এবং ছেঁড়া কাপড় পরে থাকতে পারবেন, তবু লোকের সামনে যেমন তেমন হয়ে, কি বুড়ো বুড়ো হয়ে বেড়াতে পারবেন না।

সেটা পারলেই যে লোকচক্ষে ভাল দেখাত, লোকে যে চন্দ্রাবতীকে প্রশংসাই করত তাতে, তা হয়তো জানেন চন্দ্রাবতী, তবু পারেন না। রঞ্জিত ওষ্ঠাধর, সুরঞ্জিত নখ, আধছাঁটা চুলে হালকা শ্যাম্পু আর মিহি শাড়ি ব্লাউজের কমনীয়তা, এ না হলে লোকসমাজে কি করে বেরোনো সম্ভব ভেবে পান না চন্দ্রাবতী। অথচ লোকের চোখে ভাল ঠেকে না এসব।

কিন্তু চন্দ্রাবতী কি খারাপ ? না, সে কথা কিছুতেই বলা যাবে না। চন্দ্রাবতী যদি খারাপ হতেন, একা একটা পরপুরুষের সঙ্গে গল্প করেছেন ভেবে এমন অস্বস্তি অনুভব করতেন কি ?

চন্দ্রাবতী ঘর বাড়ি সাজিয়ে রাখতে ভালবাসেন, চন্দ্রাবতী নিজেকে সাজিয়ে রাখতে ভালবাসেন। শুধু এই। অথচ কেবলমাত্র সেই অপরাধেই—

হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর একটা শাস্তি পেয়েছেন চন্দ্রাবতী সেই অপরাধে। যে শাস্তিতে পাথর হয়ে যাওয়া উচিত ছিল চন্দ্রাবতীর। তবু চন্দ্রাবতী—

তবু এখনো চন্দ্রাবতী রূপচর্চার বিলিতি ম্যাগাজিনগুলো পড়ে পড়ে প্রসাধনের কারুকলা শেখেন, নিত্য নতুন ভঙ্গীতে ঘর সাজান,

জানালায় বসানো অর্কিডের পরিচর্যা করেন, অ্যাকোয়ারিয়ামে বাহারি মাছ ছাড়েন।

কে দেখে? চন্দ্রাবতী নিজে দেখেন, তাছাড়াও দেখে অনেকেই। চন্দ্রাবতীর ফ্ল্যাটে বেড়াতে আসে ঢের লোক। এ-ফ্ল্যাটের ও-ফ্ল্যাটের চন্দ্রাবতীর বাপের বাড়ির আর শ্বশুরবাড়ির দূরতম আত্মীয়জন বন্ধুজন।

না নিকটতম কেউ আসেন না। চন্দ্রাবতীর এই সেজে-গুজে একা থাকাকে কেউ ভাল চক্ষে দেখে না।

চন্দ্রাবতীর এক ননদও একা একটা বাড়িতে থাকেন, স্বামী নেই, ছেলে দূরে থাকে, বাড়িটা আছে, সেটাকে আঁকড়ে পড়ে থাকা ছাড়া গতি কি? তিনিও চন্দ্রাবতীর মতোই একটা দাসী সম্বল করে থাকেন, এবং বয়সেও চন্দ্রাবতীরই কাছাকাছি। হয়তো বা একটু ছোটই। কিন্তু তাঁকে কেউ নিন্দে করে না।

কারণ তিনি সারা বাড়ি সাজিয়ে বেড়ান না, সাজান শুধু ঠাকুর-ঘরটি, ফুলদানীতে ফুল রাখেন না তিনি, রাখেন ঠাকুরের পায়ে। নিজেকেও যে মোটেই সাজান না তিনি, তা নয়, সাজান হরিচন্দন তিলক মাটির ছাপে। মিহি কাপড় তিনিও পরেন, সে কাপড় হচ্ছে মিহি গরদের ধুতি। না, ব্লাউজ সেমিজ পরেন না, কাটা কাপড় পরা তাঁদের গুরু সম্প্রদায়ের নিষেধ।

চন্দ্রাবতীর ননদের বাড়িতেও রাতদিন লোক সমাগম হয় বৈকি, চন্দ্রাবতীর বাড়ির চাইতে বেশিই হয়, বরং, কিন্তু তারা তো সেই ননদের সঙ্গে গল্প করতে আসে না, আসে তার ঠাকুর দেখতে, প্রসাদ পেতে, হরিগুণ গান শুনতে।

চন্দ্রাবতীর ননদও চন্দ্রাবতীর মতো একা একা ঘোরেন রিক্সা করে ট্যাক্সী করে, সে ঘোরা তো বাজার করতে কি আড্ডা দিতে যেতে নয়। গঙ্গা নাইতে, মন্দিরে মন্দিরে দেব দর্শন করতে।

চন্দ্রাবতীর একা থাকার সঙ্গে তাঁর একা থাকার তুলনা চলে না। তাই চন্দ্রাবতীর ননদকে সবাই সমীহ করে শ্রদ্ধা করে, আর চন্দ্রাবতীকে ব্যঙ্গ করে বিদ্রূপ করে।

চন্দ্রাবতীর এই নিজেকে নিয়ে নিজে সন্তুষ্ট থাকা, একা মেয়েমানুষ হয়েও ড্রইংরুম সাজিয়ে রাখা যেন অসৎ কাজেরই সামিল।

যারা দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাদের কমবয়সী ছেলে মেয়েগুলো আসে বেড়াতে। তাদের 'চন্দ্রামামী' বা 'চন্দ্রাকাকী'র বাসাটা বেজায় ভাল লাগে। চন্দ্রাবতী যে তাদের সঙ্গে হেসে হেসে মিষ্টি করে কথা বলেন, ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা জল ঢেলে সরবৎ করে দেন, এটা ভারী সুন্দর। এছাড়া চন্দ্রাবতীর শৌখিনতাটুকুই তাদের আকর্ষণীয়।

চন্দ্রাবতীর শ্বশুরকুলের ত্রিসীমানায় তো এ ধরণের চাল-চলন নেই।

তাদের বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলেই তলাপোড়া কুশ্রী একটা কেটলী বসে পড়ে উনুনে, আর চাকর দোকানে ছোটে পয়সা নিয়ে। দোকানের সেই দালদায় ভাজা একগাদা সিঙাড়া কচুরী নিমকি মেঠাই না খাওয়ালে অতিথি সৎকার সম্পন্ন হয় না এই তাদের বিশ্বাস। আর বাড়িতে থাকলে যথেচ্ছ বিশ্রীভাবে থাকবার রাইট আছে, এই তাদের অভিমত।

চন্দ্রাবতী দলছাড়া গোত্রছাড়া, চন্দ্রাবতীর আজন্মের স্বপ্ন আর সাধনা হচ্ছে কার্পেটপাতা ঘর, সাজানো ড্রইংরুম, নিঅনের আলো, ডাইনিং টেবিলে ফুলদানী লবণদানী আর মরিচদানীর সুষ্ঠু সমাবেশ। আর তার মাঝখানে ছবির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন চন্দ্রাবতী হালকা হয়ে, আলগা হয়ে।

অথচ চন্দ্রাবতীর বিয়ের আগে পর্যন্ত কেটেছে প্যাকিং বাক্সর কাঠে পেরেক ঠুকে তৈরি এক টেবিলে কাঁসার থালা কাঁসিতে খেয়ে,

এবং বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে কেটেছে রান্নাঘরের দাওয়ায় চটের আসনে বসে খেয়ে।

চন্দ্রাবতীর বর দেওরও তাই খেত। স্নান করে খালি গায়ে এসে খেতে বসত, ঘাড় হেঁট করে সপাসপ করে ভাতের গ্রাস মুখের মধ্যে চালান করত।

চন্দ্রাবতীর তাকাতে ইচ্ছে করত না সেদিকে।

কিন্তু ইচ্ছে না করলেই তো চলে না? আসলে হলোটা কী?

শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতিটা হলো কোন্ উপায়ে চন্দ্রাবতী?

উপায়? কে জানে উপায়টা কি। হয়তো ওইটার নামই অধ্যবসায়। চন্দ্রাবতীর বরের অবস্থা খারাপ ছিল না, কিন্তু অবস্থাকে উন্নত করার বুদ্ধি ছিল না, প্রেরণা ছিল না, চন্দ্রাবতীর অনলস তপস্যা আর অক্লান্ত অধ্যবসায় চন্দ্রাবতীকে এখানে এনে তুলেছিল। ঘোষ ম্যানসনের এই ছবির মতো সুন্দর দু-ঘরের ফ্ল্যাটে।

কিন্তু তপস্যা আর অধ্যবসায়ের মূল্যে যে ভাগ্যকে কিনলেন চন্দ্রাবতী, সে কি একা ভোগ করতে? একাই কি এসে উঠে-ছিলেন রাম বসু লেনের সেই পুরনো দোতলাটার আয়তনের গণ্ডি ভেঙে?

তাই কি সম্ভব? চন্দ্রাবতী কি পাগল?

রাম বসু লেনের সেই মস্ত চকমিলানো বাড়িটার খাঁজে কিল-বিলিয়ে থাকা অজস্র লোকের মধ্য থেকে সে বাড়ির সেজ ছেলেটাকে আয়তেনর গণ্ডি ভেঙে বার করে আনেননি চন্দ্রাবতী? ধাপে ধাপে ওঠেননি তাকে নিয়ে?

হ্যাঁ উঠেছেন! চন্দ্রাবতী একশোবার বলবেন, উঠেছেন।

যদিও সেই 'সেজ ছেলেটা' বলেছিল, ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছি আমরা। অধঃপতনের মসৃণ পথে তলিয়ে যাচ্ছি।

পুরনো সংস্কারের জাঁতায় চাপা মন নিয়ে ওর বেশি আর কিছু ভাবতে পারত না সে। কিন্তু চন্দ্রাবতী সেই সংস্কারাচ্ছন্ন ভাবপ্রবণতাকে গ্রাহ্য করেননি। চন্দ্রাবতী ধাপে ধাপে 'উঠেছেন'।

তারপর সব গুছিয়ে নিয়ে যখন একখানি ছোটখাটো গাড়ি কেনবার কথা ভাবছিলেন চন্দ্রাবতী, তখনই ঘটল সেই কাণ্ড। ঘটল সেই অভাবনীয়।

যেন চন্দ্রাবতীর ওই অসঙ্গত সাধকে নির্লজ্জ আর নিষ্ঠুর একটা ব্যঙ্গ করে চলে গেল চন্দ্রাবতীর স্বামী নিশিকান্ত।

তবু, তবুও চন্দ্রাবতী মানতে রাজী নয়, সাধটা অসঙ্গত। গাড়ি কি কেনে না মানুষ?

মানুষেই গাড়ি কেনে। গতিকে হাতের মুঠোয় রাখতে, জীবনকে উপভোগ করতে, গাড়িই তো প্রত্যক্ষ সহায়ক।

গাড়িহীন মানুষ আবার মানুষ!

আর চন্দ্রাবতীর সাধনাই হচ্ছে মানুষ হবার সাধনা। মানুষের মতো মানুষ!

একখানি ট্যাক্সির অপেক্ষায় বেচারীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা কী যন্ত্রণার! বার বার হাত তুলে আবার সে হাত নামিয়ে নেওয়া কী করুণ! আর সেই রকম দাঁড়িয়ে থাকা বেচারীদের নাকের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যাওয়া কী গৌরবের!

সেই গৌরব চন্দ্রাবতীকে পেতে দিল না তার স্বামী। গাড়ি কেনা আর হলো না।

অথচ টাকা জমিয়ে ফেলেছিলেন চন্দ্রাবতী। কম কষ্ট করে জমিয়েছেন? লুকিয়ে অপরকে দিয়ে রেস খেলে, সেলাইয়ের মাস্টারী করে যে কোন উপায়ে আহরণ করেছেন অর্থ। সংসারের শোভা সৌন্দর্য বজায় রেখে তিল তিল করে সঞ্চয় করেছেন টাকা। গাড়িটা কিনতে পারলেই সার্থক হবেন, জীবন সাধনায় সফল হবেন।

শক্রতা সেধে গেল নিশিকান্ত সেই সফলতার।

এখনও রাস্তায় ছোট্ট সুন্দর একখানি গাড়ি দেখলেই তাই মনের মধ্যেটা হাহাকার করে ওঠে চন্দ্রাবতীর।

গাড়িখানা হয়ে যাবার পর যদি ওই অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটত! চন্দ্রাবতীর জীবনে সম্পূর্ণতা আসত। গাড়ির জন্যে তো আর অধিক খরচ করতেন না চন্দ্রাবতী? গাড়ি হলে চালাতে শিখতে ক'দিন লাগত তাঁর? আরক্তিম নখাগ্র দিয়ে হাল্কা হাতে ধরে রাখতেন গাড়ির স্টিয়ারিং, অবলীলায় বেরিয়ে যেতেন লোকের সামনে দিয়ে। কি সুখ!

হলো না!

টাকা থাকলেও এখন আর কোন্ মুখে গাড়ি কিনবেন চন্দ্রাবতী? ভাগ্যিস আর সব হয়ে গিয়েছিল কিছু কিছু। তাই না একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে থাকতে পাচ্ছেন। বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটলে নতুন করে শখ-সাধ করাটা অসঙ্গত, কিন্তু দুর্ঘটনা হয়েছে বলে শখ-সাধের জিনিসগুলো তো আর টান মেরে ফেলে দেয় না লোকে।

শতবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছে, শতবার মনে হয়েছে কিনেই ফেলি একটা গাড়ি, না হয় সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। লোকলজ্জা বাধা দিয়েছে। হ্যাঁ লোকলজ্জাই।

লোকে যতই ভাবুক চন্দ্রাবতী হৃদয়হীন আর চোখের চামড়াহীন, লোকলজ্জাকে মানেন বৈকি চন্দ্রাবতী।

নইলে যোশী সাহেব এলেই কেন মনে হয় তাঁর চারিদিকে সহস্র চক্ষু! কেন তাতে অত অস্বস্তি। এই তো সেদিন যোশী সাহেব যখন হঠাৎ একটা ভাবলোকে পৌঁছে গিয়ে চন্দ্রাবতীর কাছে তাঁর জীবন কাহিনী বলতে সুরু করলেন, তখন সে কাহিনী যতই আকর্ষণীয় হোক, চন্দ্রাবতী তাড়াতাড়ি তার উপসংহারের দিকে ঝুঁকলেন কেন?

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই তো? সে ঘড়ি কি শুধুই চন্দ্রাবতীর রাত্রের আহারের সময় নির্দেশ করেছিল তার তীক্ষ্ণ তর্জনী তুলে?

তবু সেই কথাই বলতে হলো চন্দ্রাবতীকে, বলতে হলো, 'আপনার পাস্ট হিস্ট্রি কি সাংঘাতিক ইন্টারেস্টিং, ইচ্ছে হচ্ছে আরো শুনি, কিন্তু স্বাস্থ্যবাদী! রাত্রের খাওয়ার টাইমটা ওভার হয়ে গেলে—।'

ও-হো-হো! যোশী সাহেব সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, 'পাগলের মতো নিজের দুঃখের কথা বলে চলেছি, আপনার অসুবিধার কথা ভাবছি না। বয়েস হলে একটু হিসেব করে চলতে হবে বৈকি।'

অবশ্য তার পরেও, চন্দ্রাবতীকে বয়েস স্মরণ করিয়ে দিয়েও, খানিকটা সময় হরণ করে নিয়েছিলেন যোশী সাহেব। বলেছিলেন, 'আপনাকে যে আমি কি চক্ষে দেখেছি দিদি। আপনার কাছে প্রাণ উজাড় করে কথা বলতে ইচ্ছে করে। বলে বড় শান্তি পাই। এ সব কথা আর কখনো কাউকে বলিনি। শুধু আপনাকেই বললাম আজ। আপনাকে দেবীর মতো মনে করি আমি।'

চন্দ্রাবতী ভেবেছিলেন, শুনতে পাওয়া যায় দেওয়ালেরও কান আছে। ভেবেছিলেন, দিদি শব্দটা কতখানি শক্তিশালী রক্ষা-কবচ!

পরদিন চন্দ্রাবতী সন্ধ্যার আগে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর পদ্ধতি গ্রহণ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর গিয়েছিলেন তাঁর সেই ভক্তিমতী ননদের বাড়িতে।

ঝুলন কি রাস বা ওইরকম কিছু উৎসব উপলক্ষে ডাকেনও ননদ, তবে সঙ্গে সঙ্গে এ উপদেশও দিয়ে রাখেন, 'একটু গেরস্থালী সাজসজ্জা করে এসো বাপু। পাঁচজন আত্মকুটুম্ব আসবে, আমার বাপের বংশের বৌ তুমি, নিন্দে হলেও তো প্রাণে সয় না।'

সেই রাম বসু লেনের স্টাইলে একখানা সাদা শাড়ি সাদাসিধে করে পরে ননদের বাড়িতে গিয়ে বসেছিলেন চন্দ্রাবতী। তখন ঠাকুরঘরের দালানে কীর্তনের আসর বসেছে।

কীর্তন করছেন ভক্তিকলানিধি মাধব দাস। মধুর কণ্ঠ, মধুর রূপ আর মধুর সজ্জা।

দোয়ারদের নিয়ে মাঝখানে বসেছেন তিনি আর তাঁর দলকে ঘিরে মহিলাকুল। সঙ্কীর্ণ স্থান ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি করে বসেছেন সবাই।

ওরই মধ্যেই অনেকের হাতে খঞ্জনী! মৃদু মৃদু ধ্বনি উঠছে তা থেকে। ননদের হাত থেকেও উঠছে সে ধ্বনি। চন্দ্রাবতীকে দেখে চোখের ইশারায় বসতে বললেন।

কে একজন বললেন, 'এখন এলেন আপনি, অর্ধেক তো হয়েই গেল।' যেন কীর্তন শুনতেই এসেছেন চন্দ্রাবতী।

তবু বসলেন নীরবে। ভালই লাগছিল শুনতে। মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে উঠছিলেন গায়ক ওইটাই যা খারাপ লাগছিল।

কিন্তু খারাপ লাগার আরো কিছু বাকি-ছিল না কি? ভক্তি-কলানিধি যখন শেষ তরঙ্গ শেষ করে থামলেন, তখন তাঁর পা নিয়ে যে কাড়াকাড়ি কাণ্ডটা সুরু হয়ে গেল তা ভক্তিমতী ছাড়া আর কারো পক্ষেই কি প্রসন্ন চিত্তে দেখা সম্ভব?

চন্দ্রাবতীর মনে হলো ওঁকে কি কেউ পুরুষের মর্যাদা দিচ্ছে না? না তার থেকে অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছেন উনি? পরম পুরুষ হয়ে গেছেন?

ওঁর পায়ের তলায় হাত দিয়ে সে হাত জিভে ঠেকাল সবাই। মাথায় তো দেবেই, আচ্ছা, ওঁর সঙ্গে ওই দোয়ারের দল? সবাই পরম পুরুষ? ওদের গায়ে গা ঘেঁষে বসতে নিন্দে নেই?

হঠাৎ এই দৃশ্যের উপর যেন একটা মেঘের ছায়া এসে ঢেকে দিল। হঠাৎ মানুষগুলো যেন অন্যরকম হয়ে গেল। চন্দ্রাবতীর মনে হলো মাঝখানের ওই জায়গাটায় বসে আছেন নিশিকান্ত! নিশিকান্তর গলায় মোটা গোড়ে মালা, নিশিকান্তর পরণে মিহি শান্তিপুরী ধুতি আর মিহি উড়ুনী, নিশিকান্তর ঘাড়ে লতিয়ে পড়া চুলের বিন্যাস মনোরম।

তার মানে নিশিকান্ত অধঃপতনের পথ থেকে নিজেকে নিয়ে ধাপে ধাপে উঠেছেন। হয়তো সেই উর্ধ্বলোকে নিশিকান্তর পায়ের ধূলো নিয়েও জিভে ঠেকায় লোকে। তিপ্পান্ন বছর বয়েস হয়ে গেছে নিশিকান্তর, এতদিনে অবশ্যই এ দাবী হয়েছে তাঁর।

ওদের আসর থেকে উঠে এলেন চন্দ্রাবতী। চুপি চুপি এসে ফ্ল্যাটের দরজা খুললেন, পাছে সামনের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে একটি সহাস্য মুখ উঁকি দিয়ে বলে ওঠে, 'দিদি ফিরলেন? কোথায় গিয়েছিলেন? আমি তো তিনবার আপনার খোঁজ করে গেছি।'

না, তা হলো না।

আর আশ্চর্য, নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে ঘরে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভয়ানক একটা শূন্যতা গ্রাস করল তাঁকে। কেউ নেই চন্দ্রাবতীর জন্যে অপেক্ষা করে।

হেনা এসে দাঁড়াল। আর, হেনাই মুচকি হাসির সঙ্গে বলল, 'কোথায় গিয়েছিলেন মা? বুড়ো তো তিন চার বার খোঁজ করে গেছে।'

চন্দ্রাবতী ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, 'ভদ্রলোকদের সম্পর্কে একটু ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখ হেনা।'

মনে পড়ল না নিজেই তিনি আগে আগে ওই আখ্যা দিয়েছেন যোশী সাহেবকে। হেনার সামনেই দিয়েছেন।

হেনা গম্ভীর হলো। ঝি বলে কি সম্মান নেই তার? গম্ভীর হয়ে বলল, 'খাবার বাড়ব?'

চন্দ্রাবতী হাই তুলে বললেন, 'না, ভবানীপুরের দিদির বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।'

'ও মা! পিসিমার বাড়ি গেছলেন! তা ভাল। কিন্তু সেখানে তো খেয়ে এসেছেন মালসাভোগ, মাছ তরকারিগুলো খেয়ে নিন না?'

'নাঃ, ভাল লাগছে না, তুমি খেয়ে নাও।'

হেনা মনে মনে বলে, তবু যা হোক একদিন শুনলাম ভাল লাগছে না। নিত্যি-দিন যে এত ভাল লাগে কি করে তাই ভাবি।

হেনা চলে গেলে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়লেন চন্দ্রাবতী। অন্ধকারে ডুবে গেলেন। আর আশ্চর্য, ভক্তিকলানিধির গানও ভাবতে বসলেন না। নিশিকান্তর রূপান্তর কল্পনাতেও ছটফট করতে লাগলেন না! ভাবতে লাগলেন যোশী সাহেব আর পদ্মা যোশীর কথা।

গতকাল প্রথম যখন কাহিনীটা ফেঁদেছিলেন যোশী সাহেব, 'আমার জীবনের অনেক হিস্ট্রি আছে দিদি' বলে, তখন প্রমাদ গণেছিলেন চন্দ্রাবতী। আর যখন যোশী বলেছিলেন, সে বড়ই দুঃখের কাহিনী, তখন সেই সুযোগে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, 'থাক তবে মিস্টার যোশী, সেই দুঃখময় অতীতকে নিয়ে আর নাড়াচাড়া করবেন না, তাতে শুধু নতুন করে দুঃখই পাওয়া যাবে।'

যোশী সাহেব এ ইঙ্গিতে কর্ণপাত করেননি, বরং অধিকতর উৎসাহে বলেছিলেন, 'দরদী লোকের কাছে দুঃখের কথা বলেও সুখ আছে দিদি। আমি আজ আপনাকে আমার হিস্ট্রি শোনাব।'

চন্দ্রাবতীকেই যে কেন সাহেব দরদীচিত্ত ঠাউরে বসে আছেন

এবং আরও তেইশটা ফ্ল্যাটে সে দরদের সন্ধান করতে যান না কেন, একথা তো আর জিগ্যেস করা যায় না। ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে তো। তাই চন্দ্রাবতীকে শুনতেই হয়েছিল যোশী সাহেবের শোচনীয় অতীতের কাহিনী।

'এখন আমাকে এই দেখছেন দিদি, আগে আমি একটা বুনো জানোয়ার ছিলাম', বলে সুরু করেছিলেন যোশী সাহেব, আর তারপরে ধীরে ধীরে বিবৃত করেছিলেন সেই ইতিবৃত্ত, অবাংলা সুরের ভাঙা ভাঙা বাংলায়।

চন্দ্রাবতী ক্রমশই অবাক হচ্ছিলেন, চন্দ্রাবতীর বিশ্বাস করতে বেধেছিল। ভেবেছিলেন, কোন বইয়ে পড়া গল্প টুকে মেরে দিচ্ছে না তো লোকটা ? এই বুদ্ধু প্যাটার্নের লোকটা ও রকম দুঁদে ছিল, পানাসক্ত ছিল, এ কি সম্ভব ?

যে লোকটার আস্ত একটা মুরগী নইলে খাওয়া রুচত না, সে লোক মধু দিয়ে রুটি খেয়ে দিন কাটাচ্ছে ? এ আবার হয় না কি ?

তারপর ভেবে দেখেছেন, বোধহয় হয়। প্রতিক্রিয়া থেকে অনেক কিছু অসম্ভব ঘটনাই ঘটতে পারে। পদ্মার প্রতিহিংসা গ্রহণের ভয়ঙ্কর সেই শক্-এ লোকটার স্নায়ুগ্রন্থী সব শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে।

তাছাড়া নেশাখোর লোক যদি সহসা তার নেশা ত্যাগ করে বসে, স্নায়ুর ওপর অসম্ভব চাপ পড়ে। সেই চাপের প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় আর বুদ্ধি লোপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

তারপরই হঠাৎ কেমন রাগ হলো লোকটার ওপর। মনে মনে বলতে ইচ্ছে হলো স্ত্রীর মৃতদেহ স্পর্শ করে শপথ করতে গেলি কেন তুই ? তাতে তার কি লাভটা হলো ? এ তো প্রায় সেই চিতায় মঠ দেওয়ার মতোই। স্ত্রী বেঁচে থাকতে তুই তার রুচি পছন্দ আবেগ বাসনা সব কিছুর ওপর স্থূলতা আর বর্বরতার

রোলার চালিয়ে তাকে বাঁচতে দিলি না, আর সে মরে যাবার পর কি না ভাবতে বসলি সে কি কি ভালবাসতো, সে কিসে কিসে আহত হতো।

আর সেই ভাবনার ফলশ্রুতি হলো এই—তুই স্রেফ্ বৈষ্ণব বনে গেলি। বাঘ ছিলি খরগোশ হয়ে গেলি। তোর সেই খরগোশ রূপ দেখতে আসছে তোর পদ্মা? আসছে না।

অথচ তুই রুটি আর মধু খেতে খেতে ভাবছিস পদ্মার আত্মা তৃপ্ত হয়েছে। ভোঁতা, ভোঁতা, একদম ভোঁতা হয়ে গেছে। ভোঁতা বলেই সরল দেখায়, সাদাসিধে দেখায়।

চন্দ্রাবতী যদি ওর জীবন-কথা না শুনতেন শুধু করুণাই থেকে যেত ওর উপর, এমন ধিক্কার আসত না।

তবু—

চন্দ্রাবতী ভেবেছিলেন সেই অন্ধকারের অরণ্যে ডুবে পড়ে থেকে, পদ্মা যোশী যদি শাড়িতে আগুন লাগিয়ে মারা না গিয়ে, এ-জীবন অসহ্য বলে কোথাও চলে যেত, যদি মঠে মন্দিরে কি গুরু আশ্রমে বাস করতে থাকত, যোশী সাহেবের এই উথলে ওঠা প্রেমটি থাকত বজায়?

তাহলেও কি যোশী সাহেব আস্ত মুরগীর বদলে ঝিঙে আর ধুঁধুলের সব্জী দিয়ে ডিনার সারতেন?

তা হতো না। পদ্মা যোশী ভারী তুখোড় মেয়ে ছিল, নিজে মরে লোকটাকে মেরে রেখে গেল। অসহায়ের ওইটাই তো সেরা অস্ত্র মরে জিতে যাওয়া।

চন্দ্রাবতী জিতে যাওয়ার এই পন্থাটিকে ঘৃণা করেন, ঘৃণা না করলে হয়তো চন্দ্রাবতী রাম বসু লেনের সেই চকমিলানো বাড়িটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়তে পারতেন না। ওর মধ্যেই কোথাও ঝুলে পড়ে কি আগুনে পুড়ে পোড়ার জ্বালা ধরিয়ে রেখে যেতেন নিশিকান্তর বাকি জীবনটাতে।

চন্দ্রাবতী যুদ্ধ করে জিততে চান, হেরে গিয়ে তোমার মনের তারে ঘা মেরে মেরে, হীন সুযোগ নিয়ে কাপুরুষের জেতা জিততে চান না।

পদ্মা যোশী কাপুরুষ। তবু সেই কাপুরুষ পদ্মা যোশীর মন-গড়া যন্ত্রণার যন্ত্রণাময় জীবন-কাহিনী আকৃষ্ট করে রেখেছিল চন্দ্রাবতীকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার প্রতিটি দিন রাতের ইতিহাস শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল, তাই ওই যোশী সাহেব আমার মধ্যে কী একটা অলৌকিক দরদ দেখতে পায়। একই দুঃখে দুঃখী দু-জনে, একই যন্ত্রণায় জর্জরিত।

একই গ্রহের ক্রূর পরিহাসে পিষ্ট যোশী আর চন্দ্রাবতী।

চন্দ্রাবতীকেও ওই পদ্মা যোশীর মতো একখানা 'ঠাণ্ডারক্ত' নিয়ে ঘর করতে হয়েছে সারাজীবন। তবু তাকে দিয়েই যে এই ঘর বেঁধে তুলেছেন, এই সোফা-সেটি এই কার্পেট-পর্দা, এই টেলিফোন-রেফ্রিজারেটর, এই অর্কিড্-নিঅন লাইট, সে কি সোজা যুদ্ধ?

চন্দ্রাবতী যখন প্রথম বলেছিলো, 'এইভাবে গোয়ালের গরুর মতো শুধু ঘাস জল খেয়ে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন।' তখন নিশিকান্ত অবাক হয়ে গিয়ে বলেছিলো, 'তবে কীভাবে বাঁচাটা তোমার কাছে অর্থপূর্ণ?'

তখন চন্দ্রাবতীর বয়েস অল্প তাই ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিলো, 'মানুষের মতন বাঁচা।'

'আমি তো বলি এই গোয়ালের গরুর জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। সবাই মিলে-মিশে একান্নবর্তী হয়ে থাকা—'

'আহা, মিলে-মিশে তো কত!' চন্দ্রাবতী বলেছিলো, 'রাতদিন ঝগড়া রাগারাগি হিংসে—'

'সে তোমাদের ওই মেয়েমানুষদের মধ্যেই—'

'ইস। আর নিজেদের মধ্যে নয়। কাল ছোট ঠাকুরপোর আর মেজ বটঠাকুরের যা একখানা হয়ে গেল—'

'সে কথা ছেড়ে দাও, সহোদর ভাই, মেরে যায় ফিরে চায়।'

'ফিরে চাইতে তো দেখি না কোনদিন। এই যে তোমার সেদিন অত অসুখ করল, তোমার ভাইরা ঘরে ঢুকেছিল ?'

'ইস কী নেমকহারাম, বৌদিরাই তো সেবা করে পথ্যি করে—'

'সে তো বৌদিরা। মানে এই অধম মেয়েমানুষরা। তার ওপর আবার পরের মেয়ে। তোমার সহোদর ভাইরা তো—'

'থামো, একেই বলে ঘর ভাঙানী—'

'ঠিকই বলেছ! ঘর ভাঙতেই চাই! ভেঙে নিজের মনের মতো ঘর গড়ব—এই আমার ইচ্ছে।'

'তোমার ইচ্ছে নিয়ে তুমি একা গড়গে' ঘর।'

'আচ্ছা, দেখা যাক।'

হ্যাঁ, এই রকম ছিল প্রথম দিকের কথা-বার্তা। এই রকম সেকেলে টাইপের সাদামাঠা কথার বাদ-প্রতিবাদ। এই সাদা-মাঠাতেই অভ্যস্ত ছিলেন তখন।

কিন্তু চন্দ্রাবতী ওই সাদামাঠার মধ্যে কোন রোমাঞ্চ খুঁজে পাননি। চন্দ্রাবতী যদি খারাপ মেয়ে হতেন, হয়তো ওই মেয়েলি প্রকৃতি পুরুষের ঘরকে ঘৃণায় ত্যাগ করে জীবনের নতুন মানে খুঁজতে বেরোতেন, কিন্তু চন্দ্রাবতী খারাপ মেয়ে নন। চন্দ্রাবতী তাই ভস্মস্তূপে বাতাস দিয়ে দিয়ে অগ্নিকণা খুঁজেছেন।

ক্রমশ পালা বদলেছে, মা মরেছেন নিশিকান্তর। ছোটভাই আর মেজভাই এক রান্নাঘরেই আলাদা হাঁড়ি চড়িয়েছেন, আর সেজ বৌয়ের বিবিয়ানার সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে সংসার।

বাঁজা মেয়েমানুষ, কোথায় ভাসুরপো দেওরপোদের মা হয়ে তাদের দেখা-শোনা করবে। তা নয় শুধু নিজের ঘরটি ফিটফাট আর নিজের দেহটি ফিটফাট! এছাড়া কাজ নেই।

আবার বলে কি না 'ছেলেমেয়ে হয়নি, বেঁচেছি।'

বলে, 'উঃ, ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়, ওই রকম এক গাদা গুণ্ডা আমার ঘরেও হৈ হৈ করছে।'

ছেলে সইতে পারে না এ কেমন মেয়েমানুষ? ছি ছি।

বোধ করি অনবরত স্ত্রীর সমালোচনা শুনতে শুনতে উত্যক্ত নিশিকান্ত শেষ অবধি গোয়াল ছাড়তে রাজী হয়েছিলেন। হয়তো বা ভেবেছিলেন আলাদা হওয়ার এত সাধ, হয়ে বুঝুক মজা। এমন পায়ের ওপর পা দিয়ে দোতলায় বসে থাকার আয়েস বেরিয়ে যাবে।

মোট কথা সেই চকমিলানো ভাঙা দোতলার গহ্বর থেকে অবশেষে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন চন্দ্রাবতী। আর তখন থেকেই সুরু হয়েছিল তাঁর জীবন সাধনা। মানুষের জীবনের সাধনা।

সাধনা! কিন্তু কাকে নিয়ে?

একটা বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষ নিয়ে। যেদিন প্রথম টেবিলে খেতে দেওয়া হলো নিশিকান্তকে, রেগে আগুন হয়ে বললেন তিনি, 'আমাকে মাটিতে পিঁড়ে পেতে দিয়ে দাও, ও সব ম্লেচ্ছাচার সহ্য হয় না আমার।'

চন্দ্রাবতী তবু হেসে বললেন, 'তুমি মাটিতে বসবে, আমি টেবিলে?'

'বোসো না, তাতে কি? তোমার উচ্চাশা বেশি। তোমাকেই উচ্চাসন মানায়।'

কেউই অতএব বসল না সেদিন টেবিলে, কিন্তু ক্রমশই দেখা গেল নিশিকান্তকে বাগে এনেছেন চন্দ্রবতী, দু'জনেই টেবিলে বসেছেন মুখোমুখি! তবে প্রসন্নতার ছাপ নেই কোন মুখেই।

চন্দ্রাবতী অনবরত বলছেন, 'অমন এলোমেলো করে হাতে মেখে খাচ্ছ কেন? কাঁটা চামচ সবই তো রয়েছে হাতের কাছে।'

আর নিশিকান্ত অনবরত বলছেন, 'কোথায় নেমে যাচ্ছি তাই ভাবছি।'

অহরহ এই কথাটাই ভাবতেন নিশিকান্ত। চন্দ্রাবতী একটা শৌখিন টেবিল ল্যাম্প কিনলেও বলতেন, 'কোথায় নেমে যাচ্ছি আমরা।' চন্দ্রাবতী একসেট ভাল চায়ের বাসন কিনলেও বলতেন, 'কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

কিন্তু চন্দ্রাবতী কি সেই আক্ষেপে কর্ণপাত করেছেন ? চন্দ্রাবতীও কি যোশী সাহেবের মতো লোডেড বন্দুক নিয়ে আস্ফালন করেননি ? বুড়ো বয়েসে চন্দ্রাবতী কি ঠোঁটে রং দিতে সুরু করেননি ? নখে পালিস, চোখে কাজল ?

লুকিয়ে লুকিয়ে পাড়ার ছেলেকে দিয়ে রেস খেলিয়ে সেই টাকায় আধুনিক গৃহসজ্জা কেনেননি ? আবেদন-নিবেদন করে করে টেলি-ফোন আনাননি বাড়িতে ?

ক্রমশই ব্লাউজের ছাঁটে অতি আধুনিকতার আমদানী করেননি ? শাড়িতে অতি সূক্ষ্মতা ? সাজানো ড্রয়িংরুমে তরুণ-তরুণীর আসর বসাননি ? তাদের সঙ্গে সোফায় গা হেলিয়ে বসে শাটিনের কুশন লোফালুফি করতে করতে তাদের মত কথা বলতে শেখেননি ?

হচ্ছিল, ক্রমশই সব কিছু বদল হচ্ছিল চন্দ্রাবতীর। সাজ-পোশাক, হাব-ভাব, কথা-বার্তা, খাওয়া-দাওয়ার রুচি।

দেশী রান্নার নির্বাসন ঘটে যাচ্ছিল দ্রুত, দু'বেলাই ডিম-মাংস পুডিং-কেকের আবির্ভাব ঘটছিল পাতে। বিদেশী ম্যাগাজিন আসতে সুরু করছিল বাংলার বদলে। চন্দ্রাবতী ভাবছিলেন ধাপে ধাপে উঠছি আমি। আর নিশিকান্ত প্রতিনিয়ত বলছিলেন, 'কোথায় নেমে যাচ্ছি আমরা!'

এই সময় হঠাৎ চন্দ্রাবতীর এই মনস্থির হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে গুরুদীক্ষা নিয়ে বসল সে।

নিশিকান্ত যেন মেয়ের সামনে একটি দেবী দেখলেন। নিশিকান্ত ভক্তিভরে তাঁর মেয়ের সেই গুরুর পায়ে মাথা নত করলেন। নিশিকান্ত সাত মাসে দর্শন করলেন, নতুন জীবনের স্বাদ লাভ করলেন।

আবার ঠিক সেই সময় পাড়ার বারো টাকা জমিয়েছেন চন্দ্রাবতী, আর 'বিউটি পার্লার'-এ গিয়ে চুল ছাঁটিয়ে এসেছেন সেই তাঁর কোমরতী কন্যার মতো বিরাট চুলগুলোকে ঘুচিয়ে। হয়তো দু একদিন চোখ পড়েনি, হয়তো মেয়েমানুষের দিকে তাকানো বারণ নিয়ম ছিল নিশিকান্তর, হঠাৎই চোখ পড়ে গেল।

নিশিকান্তর তখন অপারেশনের কাল, বইয়ের কুঁড়ি গড়ে তৈরি ঘরের একটা কোণে শুকনো রক্ষা করে, গম্ভীরভাবে নিজের হাত চাপিয়ে দিলেন, এবং চন্দ্রাবতী নিশিকান্তকে শুনিয়ে শুনিয়ে চাকরকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'ও-বেলা দু-জন লোক খাবে বুঝলে? কাজেই অনেকটাই হবে কিছু, আর চাই মাছ। না কুড়ি নয়, সামান্য কিছু কাবেজ রাইস আর মোটা রুটি—।' বেশ বড় গলাতেই বলছিলেন।

মেয়ের বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের বৈধব্য এসেছে অতীতে না জেনে খাচ্ছিল চন্দ্রাবতীর, গুরুদীক্ষা শুনে কিন্তু লাগছিল। ভেবেছিলেন, দেখি ক'দিন থাকে এই ভড়ং!

তা সেই চাকরকে নির্দেশ দিয়ে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, দেখলেন ঠাকুর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন নিশিকান্ত। তাঁর দিকেই তাকিয়ে।

মনে মনে পুলকিত হলেন। ভাবলেন, আর কিছু নয়, তাঁর মেয়ে যে এখনো তরুণীর আবাসা, সেটা নতুন করে অনুধাবন করছেন নিশিকান্ত। ভড়ং আর ক'দিন থাকে?

চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলিয়ে বললেন, 'ফাউল কাটলেটের ভাগ চাও তো বল, আর কিছু বাড়তি করি—'

নিশিকান্ত তার উত্তর দিলেন না, বললেন, 'তুমি চুল কেটেছ ?'

চন্দ্রাবতী বললেন, 'যাক, তবু আমার দিকে এটুকু নজরও পড়েছে !'

নিশিকান্ত বললেন, 'সধবা স্ত্রীলোককে চুল কাটতে নেই, এটাও বোধহয় তোমার জানা ছিল না ?'

চন্দ্রাবতী বললেন, 'জানা থাকবে না কেন ? মানার প্রয়োজন বোধ করিনি।'

'ওঃ ! আচ্ছা !' বলে ঘরে ঢুকে গেলেন নিশিকান্ত।

চন্দ্রাবতী এটা আশা করেননি, ভেবেছিলেন এই উপলক্ষে বেশ এক পালা হয়ে যাবে, আর সেই সূত্রে চন্দ্রাবতী নিশিকান্তর ব্রহ্মচর্য আর স্বপাকের ওপর ব্যঙ্গের ছুরি হেনে খণ্ড খণ্ড করবেন। কিন্তু সেই বেশ এক পালা হলো না।

চন্দ্রাবতী নিজেই তখন গলা বাড়িয়ে বলে উঠলেন, 'ঘরে ঢোকার তো হুকুম নেই, এখান থেকেই জিগ্যেস করি, ব্রহ্মচারীর স্ত্রী কি সধবা পদবাচ্য হয় ? তোমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে কি বলে ?'

নিশিকান্তর কাছ থেকে উত্তর আসে না।

চন্দ্রাবতী আবার বলে ওঠেন, 'আমার মতে সন্নিসীর স্ত্রী বিধবার সামিল !' হ্যাঁ এ-কথা বলেছিলেন চন্দ্রাবতী।

কিন্তু এ-রকম স্পর্ধার কথা তো চিরদিনই বলে এসেছেন তিনি। ওই রকম যথেচ্ছ বলে বলেই তো নিজের অনুকূলে চালিয়ে এসেছেন মানুষটাকে। কেমন করে বুঝবেন, সেদিনের সেই কথাটাকে নিশিকান্ত নিজের অনুকূলে গ্রহণ করে এত বড় সুযোগ নেবেন ? তাছাড়া আর কি ?

সেদিন সেই স্বপাকের অন্ন পড়ে রইল, এক লাইন চিঠি লিখে চিরতরে সংসার থেকে বিদায় নিলেন নিশিকান্ত। লিখে রেখে

গেলেন, 'সংসার-জীবন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, গুরু আশ্রমে স্থায়ী বাসের সংকল্প নিয়ে চলে যাচ্ছি, সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক।'

চন্দ্রাবতী কি ভয় পাননি? পেয়েছিলেন বৈকি!

সেও তো হয়ে গেল সাত আট বছর। বয়েস কম ছিল। তবু বিশ্বাস করেননি, এটা সত্যি। ভেবেছিলেন ভয় দেখানো, ভেবেছিলেন সাধে কি আর ওই গুরুদীক্ষা স্বপাক নিরামিষ ইত্যাদি হাড়ের বিষ আমার! ওসব করতে গেলেই কিম্ভূতকিমাকার হয়ে যায় মানুষ। ওই টুনিটাই আমার শনি হলো। ওটা যদি বিধবা না হতো, বিধবা হতে হতেই যদি না গুরুদীক্ষার ভড়ং করতে বসত!

তবু ওর কাছেই গিয়েছিলেন ছুটে, সেই দু-লাইন লেখা নিয়ে।

ননদ বলেছিল, 'এ আমি বুঝেছিলাম। সেজদার ওপর যে গুরুর কৃপা প্রবল হয়েছে বুঝতে পেরেছিলাম।'

চন্দ্রাবতী বিরক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'তা বেশ। এখন তোমার সেই গুরু আশ্রমের ঠিকানাটা দাও দিকি—'

ননদ মাথা নেড়েছিল, 'সে হয় না। সন্ন্যাসের সংকল্প যদি করে থাকেন সেজদা, এখন তো এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে।'

'চমৎকার, আমার অবস্থাটা কি হবে?'

ননদ মৃদু হেসে বলেছিল, 'কে কার অবস্থার কথা ভাবে বল? আমার কি অবস্থা হলো?'

চন্দ্রাবতীর মুখে আসছিল, 'তোমার তো ছেলেমেয়ে আছে।'

কিন্তু সদ্য বিধবাকে আর বললেন না সে-কথা, বললেন, 'ভাগ্যের ওপর তো হাত নেই। আর এটা হচ্ছে ইচ্ছাকৃত।'

'এটাও ভাগ্য সেজ বৌদি! তোমার পরম ভাগ্য তাই অমন স্বামী পেয়েছিলে। যদি এখনো নিজের ঢং ঢাং ছেড়ে গুরুর চরণে গিয়ে পড়তে পারো, হয়তো তরে যাও।'

'তরে যাবার দরকার নেই আমার, তোমরাই তরো ভাই বোনে, সশরীরে স্বর্গে যাও।' বলে উঠে এসেছিলেন চন্দ্রাবতী, আর ননদ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, 'তুমি বোধ করি দ্বিতীয় পথটাই শ্রেয় বোধ করছ? নরকের পথ।'

গুরুদীক্ষা নিয়েছে আর সদ্য স্বামী হারিয়েছে বলে যে কথার ঝাঁজ হারিয়েছে তা নয়। সমবয়সী এই ভাজটিকে দু-কথা শুনিয়ে দিতে পারলে কখনই ছাড়ে না সে, আজো ছাড়ল না।

'তোমাদের মতে তো আমি চিরকালই নরকের পথে আছি। নতুন হবে না সেটা।' বলে ক্রুদ্ধ চন্দ্রাবতী উঠে এসেছিলেন, আর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, নিশিকান্তর এই কদর্য প্রতিশোধের প্রতিশোধ তিনিও নেবেন। অগ্রাহ্য করবেন এই দুর্ভাগ্যকে। যেমন খাচ্ছিলেন মাখছিলেন বেড়াচ্ছিলেন, তেমনিই চালিয়ে যাবেন। ওই আত্মীয়-জনকে দেখিয়ে দেবেন কারুর জন্যে কিছুই এসে যায় না চন্দ্রাবতীর। টাকা? রয়েছে তো কিছু! তাছাড়া চন্দ্রাবতীর ওই উপার্জনের পথগুলোও আছে বৈকি কিছু কিছু। চালিয়ে নেবেন। ভালভাবেই চালিয়ে নেবেন।

সেই চালিয়েই চলেছেন। এই দীর্ঘ আট ন' বছর চালাচ্ছেনও।

প্রথমে এখানের কাউকে কিছু বলেননি, ক্রমশ প্রকাশ পেয়ে গেল। পরিচিত ফ্ল্যাটের সবাই ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে থাকে। 'উনি কোথায়? মিস্টার দত্ত?'

চন্দ্রাবতী গম্ভীরভাবে বলেন, 'সন্নিসী হয়ে গেছেন।'

ওরা ভাবে পরিহাস। ভাবে অফিসের কাজে গেছে কোথাও। ভাবে বদলী হয়ে গেল না তো?

তারপর জানাজানি হয়ে গেল। সত্যিই যে সাধু মহারাজ

বনে গিয়ে গুরু আশ্রমে পড়ে আছে লোকটা তার প্রমাণও পাওয়া গেল।

আড়ালে হাসাহাসি করেছে সবাই। বলেছে 'মিলনটা ভালই হয়েছিল। মেমসাহেব আর সাধু মহারাজ! দেখবার মতো কম্বিনেশান।'

বলেছে, কারণ ওরা এই অবস্থাটাই দেখেছে শুধু। চন্দ্রাবতী আর নিশিকান্তর বিয়ের সময়কার ফটোটাও কোনদিন দেখেনি। সিল্কের পাঞ্জাবী আর কোঁচানো ধুতিপরা লম্বা চওড়া স্মার্ট চেহারার নিশিকান্তর পাশে কপালে টায়রা আর নাকে নোলক পরা গোলগাল মুখ চন্দ্রাবতীকে যে বোকার মতো দেখতে লাগছে তাতে, তা ওরা জানে না।

ওরা বলে, ভেতরে কথা আছে। বলে, গিন্নীর জ্বালাতেই বোধহয় কত্তার এই ডিসিশান।

সকলে জেনে গেল তেরো নম্বরের মিসেস দত্তর স্বামী সত্যিই চিরতরে বিবাগী হয়ে গেছেন। আর এ সংসারে ফিরে আসবেন না।

বহু মানুষের বাস এখানে। বিচিত্র চরিত্রের পসরা। কেউ কর্তাকে সমর্থন করে, কেউ গিন্নীকে। কেউ বলে, আশ্চর্য, এ যুগে এমন দুর্লভ ভক্ত দেখা যায় না। কেউ বলে, অদ্ভুত! এ রকম স্বার্থপর লোক এ যুগেও দুর্লভ।

স্বার্থপর বৈকি, নিজের পরকালটাই দেখল, বিবাহিতা স্ত্রীর ইহকালটা দেখল না।

কিন্তু তখন যোশী সাহেব আসেননি। যোশী সাহেব পরে এসেছিলেন। আবার আসামাত্রও কিছু আর শোনেননি, পরে শুনেছেন।

তখন তো খবরটা হট্‌কেকের মতো নয়, যোশী সাহেব আসা মাত্রই কেউ তাঁর কানে তুলতে যাবে ?

বাসি পুরনো খবরটা কতদিন পরে যেন শুনলেন।

যোশী সাহেবের সামনের ফ্ল্যাট বলেই হয়তো উঠল কথাটা।

কিন্তু তার আগেই তো যোশী সাহেব দিদি পাতিয়ে বসে আছেন। দেবীর মতো দেখছেন চন্দ্রাবতীকে।

তারপর দেবীর জীবনের এই দুঃখ কাহিনী তাঁকে আরো বিগলিত করেছে। আকর্ষণ আরো প্রবল করে তুলেছে। যোশী সাহেব যদি বাঙালী হতেন, নিশ্চয় চন্দ্রাবতীর 'তবুও' এমন সুখে আরামে থাকা নিয়ে সমালোচনায় তৎপর হতেন, কিন্তু ওঁর চোখে এটা বিসদৃশ লাগেনি। বরং একা মহিলা এমনভাবে আছেন ভেবে প্রশংসার চোখ নিয়েই দেখছেন।

কিন্তু চন্দ্রাবতীর দিক থেকে অন্যরকম হলো। যোশী সাহেবের জীবন তাঁকে অন্যভাবে বিচলিত করল। অভিভূত হলেন ওর পূর্বপ্রকৃতি শুনে, বিমুখ হলেন ওর বর্তমানের রূপ দেখে।

শোক পেয়ে বাঘ হরিণ হয়ে গেল, শক্‌ খেয়ে সিংহ খরগোশ হয়ে গেল, এর চাইতে অরুচিকর খবর আর কী আছে ? ছিঃ !

ওর ওই ভিজে স্যাঁৎসেতে সেন্টিমেন্টকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজ স্বভাবে আনা যেত যদি !

ভেবেছেন।

তবু ক'টা দিন প্রায় পালিয়ে পালিয়েই বেড়ালেন চন্দ্রাবতী। কারণ যোশী সাহেব তো সেদিন সব কথা শেষ করেননি। বলেছিলেন, 'পদ্মার ফটো দেখাব আপনাকে। দেখাব পদ্মার হাতের আঁকা ছবি। অনেক অবকাশ ছিল, বসে বসে ছবি আঁকত। তখন ওগুলোকে ছেলে খেলা ভাবতাম, এখন দেখি বাস্তবিকই সুন্দর।'

তার মানে সে সৌন্দর্য আরোপ করেছেন যোশী সাহেব তাঁর মৃতা স্ত্রীর প্রতি প্রেমের শ্রদ্ধায়।

কিন্তু সে সশ্রদ্ধ প্রেমের আকুতি দেখবার বাসনা নেই চন্দ্রাবতীর। বরং, যাক দু'দিন ভুলে যাক সে কথা।

তাছাড়া—

হ্যাঁ, তাছাড়াও একটা জিনিস আছে বৈকি। যোশী সাহেব যে সেদিন রাত প্রায় দশটা বাজিয়ে ফেলেছিলেন, সেটা আর কেউ দেখুক না দেখুক হেনা দেখেছিল। আর হেনার বান্ধবীকুলও অতএব শুনেছিল। তাদের মারফৎ তাদের মনিবাণীরাও অতএব জেনেছিলেন। কারণ পরদিন পনেরো নম্বরের গৃহিণী বেড়াতে এলেন।

এলেন দুপুরের দিকে।

অমায়িক হাস্যে বললেন, 'অসময়ে জ্বালাতন করতে এলাম! আপনি বোধহয় এখন ঘুমোতেন একটু?'

'আমি দুপুরে ঘুমোই না।' চন্দ্রাবতী বলেন।

'অ! তাহলেও সন্ধ্যেবেলাটাই বেড়াতে আসার সময়, তবে অনেক রাত অবধি আলো-টালো জ্বলে আপনার ঘরে, মনে হয় বাইরের কেউ এসেছেন বোধহয়, তাই আর সে সময় আসি না।'

চন্দ্রাবতীর ইচ্ছা হয় বলেন, 'আসতেই হবে, এমন মাথার দিব্য আপনাকে দিল কে?' কিন্তু বলতে পারেন না।

ভদ্ররুচির মানুষ চন্দ্রাবতী শান্ত গলায় বলেন, 'না না, বাইরের লোক আর রোজ রোজ কে আসবে? এসে বসেন সামনের ফ্ল্যাটের যোশী সাহেব। আমারই মত নিঃসঙ্গ অবস্থা তো ওঁরও!'

ভদ্রমহিলা বোধ করি এ উত্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, ঈষৎ শুকনো মুখে বলেন, 'ও! খুব গল্পে লোক বুঝি?'

চন্দ্রাবতী ওর মুখের দিকে তাকান। ভিতরে ভিতরে শক্ত করে নেন নিজেকে। আরো শান্ত গলায় বলেন, 'খুব একটা

নয়। বেশির ভাগ তো বসেই থাকেন চুপচাপ। আমার মধ্যে উনি যে কি দেখেছেন ঈশ্বর জানেন, দেবী বলে নাকি ভ্রম হয় ওঁর আমাকে।'

ভদ্রমহিলার মুখটা আরো কালিবর্ণ হয়ে যায়। তবে তিনিও নিজেকে সামলে নেন। বলেন, 'কে কখন কাকে কি চক্ষে দেখে! আমরা তো বাপু আপনাকে মেমসাহেব ডাকি! তবু যাই হোক, ভালই হয়েছে যে, সন্ধ্যেবেলাটা কাটাতে এমন একটি সঙ্গী পেয়েছেন! আমরা তো সংসার নিয়েই মশ্‌গুল, আপনি বেচারী যে একেবারে একা পড়ে আছেন, মনেই থাকে না। আসতেও পারি না।'

চন্দ্রাবতী হেসে ওঠেন। বলেন, 'একা পড়ে থাকি মানে? আমি কি চেয়ার টেবিল না বাসনপত্র, যে পড়ে থাকব? ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে পড়ি। তবে হ্যাঁ, যোশী সাহেব এসে বসেন, তাই আর বেরিয়ে পড়ার দরকার হয় না।'

ভদ্রমহিলাকে অগত্যাই বিদায় নিতে হয়েছিল, কিন্তু এই বিদায় দেওয়ায় কি সুখ আছে? না শান্তি আছে? এ তো শুধু ঢালখানা সামনে ধরে আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে চলা। অথচ চন্দ্রাবতী তরুণী নন। তরুণীর সজ্জায় থাকতে ভালবাসেন এই পর্যন্ত। সেইটাই নিন্দনীয়। অবাঙালীরা অমন নয়। ওরা জানে নারী দেবী, নারী লক্ষ্মী, নারী সংসারের শ্রী! নারীকে সব বয়সেই শ্রীমতী হয়ে থাকতে হয়।

বাঙালীর দৃষ্টি আচ্ছন্ন। বাঙালী তার সমাজের মেয়েদের প্রতিটি আচরণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বসে থাকে, আর সন্দেহের কাল ছাপ চোখে মেখে ভাবে, ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না।

চট করে কুৎসিত একটা মন্তব্য করে বসা আদৌ অসম্ভব নয় বাঙালীর পক্ষে। ওই মহিলাটিই যদি এখন রটিয়ে বেড়ান, মিসেস দত্তর মিসেস যোশী বনে যেতে বেশি দেরী নেই—বিস্মিত হবেন না

চন্দ্রাবতী। কিন্তু অস্বস্তিকে ঠেকাতে পারবেন কি? যতই অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করুন, স্বস্তি কোথায়?

তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো।

তাই পর পর দু'দিন ননদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া।

ননদ বলে, 'কি গো ডুমুরের ফুল, এত ভাগ্যি আমার, কাল এসেছ আবার আজ!'

'ভাগ্যি না অভাগ্যি।' শাড়ির রঙের সঙ্গে ম্যাচ্ করা রঙিন বটুয়াটা হাতে দোলাতে দোলাতে চন্দ্রাবতী বলেন, 'আমার মতো মহাপাতকীর মুখ দেখলে তো তোমাদের দিন ভাল যায় না।'

ননদ মসৃণ একটু হাসি হেসে বলেন, 'আমার দিন খারাপ করে দিতে পারে এমন সাধ্য কার? রাধাগোবিন্দর সেটুকু দয়া আছে।'

'যাক নিশ্চিন্ত হলাম। গান হবে না আজ?'

ননদ অমায়িক মধুর আর সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'না। ঠাকুরের আজ মৌনের দিন। আজ তিনি অন্তরালে সাধন ভজন করেন।'

চন্দ্রাবতী মনে মনে বলেন, 'তার মানে সারাদিন পড়ে ঘুম মারেন আর কি। কীর্তনে তো কম পরিশ্রম হয় না!' মুখে বলেন, 'কারুর সঙ্গে কথা কন না?'

'কন।' ননদ মধুর হাস্যের সঙ্গে বলেন, 'তেমন আকুল ভক্তের সঙ্গে কন।'

চন্দ্রাবতী ভাবেন, হয়তো নিভৃতেই কথা কন। হয়তো ঠাকুরের পা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেন চন্দ্রাবতীর ভক্তিমতী ননদিনী। ঠাকুর সেবা নেবেন না, উনিও সেবা না করে ছাড়বেন না। অথচ টুনির মনে কোন অস্বস্তি নেই।

কারণ টুনি ভক্তিমতী। টুনি গুরুর দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে বসে কথামৃত পান করে।

আজ হঠাৎ মনকে শক্ত করলেন চন্দ্রাবতী, আজ বিকেল বেলাতেই হেনাকে দিয়ে যোশী সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'যা বলগে যা, মা আজকে আপনাকে এখানে মায়ের সঙ্গে চা খেতে বললেন।'

হেনা কিছু মনে করবে? করুক। তাই চান চন্দ্রাবতী।

যোশী সাহেব অভাবনীয় সেই সৌভাগ্যভারে ছলছল করতে করতে তৎক্ষণাৎ চলে এসেছিলেন। চন্দ্রাবতীর হাতের চা খেতে খেতে মুগ্ধ বচনে বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছে এমন সুন্দর চা পদ্মার হাতে ছাড়া আর কখনো খাইনি। আসল কথা, সব বস্তুই গ্রহণ করে মন। সব বস্তুই অমৃত হয়ে ওঠে স্নেহের স্পর্শে। আপনি যে স্নেহের হাতে এগিয়ে দিয়েছিলেন এই চায়ের পেয়ালাটি, সেই স্নেহই—'

পদ্মা আর স্নেহ দুটো শব্দই বিরক্তিকর, তবু সহ্য করা ভিন্ন উপায় কি! উপায় কি যোশী সাহেবের জোলো দার্শনিকতার কথায় সুর মেশানো ছাড়া!

সহ্য করতে হবে। ভদ্রতার দায়ে সব কিছুই সহ্য করতে হবে। যোশী সাহেব যখন সায়াহ্নের পশ্চিম আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে চন্দ্রাবতীকে নিজের দলে টেনে বলবেন, 'আমরাও ওই রকম অস্তাচলের পথে—' তখন মাথা কাৎ করে বলতে হবে, 'তা বটে!'

তবে চন্দ্রাবতী এত ঘটা করে ডেকে পাঠালেন কেন ওকে? কেন নিজেকে এত মনোরম সাজিয়ে কনে দেখা আলোর দিকে মুখ করিয়ে বসালেন?

চন্দ্রাবতী খারাপ মেয়ে নন, তবু করেছেন এসব চন্দ্রাবতী। কেন? জানেন না সে কথা। চন্দ্রাবতী কি দেখতে চেয়েছিলেন ওই মৃত লোকটার মধ্যে আবার জীবনের সঞ্চার করা যায় কি

না। না কি দেখাতে চেয়েছিলেন পদ্মার চাইতেও সুন্দর মুখ আছে জগতে।

অথবা এসব কিছুই নয়, অনুপস্থিত নিশিকান্তর কোন এক ভক্তিমতী শিষ্যার উপর এ এক অদ্ভুত প্রতিশোধ গ্রহণ। নয়তো বা নিশিকান্তর উপরই।

কিন্তু নিশিকান্ত তো মাত্র আজ গৃহত্যাগ করেননি। এতদিন পরে নিশিকান্তর পরিত্যক্ত স্ত্রী প্রতিশোধে হিংস্র হবে কেন? যখন তাকে লোকে অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোর সঙ্গে তুলনা করছে তখন?

হয়তো এমনই হয়।

আশা প্রতীক্ষা সব নির্মূল হয়ে গেলে তবেই মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে।

কিন্তু এ প্রতিশোধ যে শুধু নিজেকেই আঘাত হানবে, একথা কি খেয়াল করছেন না চন্দ্রাবতী? নিশিকান্ত তো দেখতে আসবেন না, চন্দ্রাবতী নিজেকে ছবির মতো সাজিয়ে কনে-দেখা আলোর দিকে মুখ করে বসে আছেন এক বিহ্বল দৃষ্টি প্রৌঢ়ের সামনে। দেখতে পেলে তবেই তো সার্থক এই যুদ্ধ। এই চেষ্টা।

যোশী সাহেব চলে যাওয়ার পর সহসা যেন ভয়ানক একটা যন্ত্রণা অনুভব করলেন চন্দ্রাবতী। এ যন্ত্রণা কোন্ ব্যর্থতার? রূপ সাধনার?

চন্দ্রাবতীর রূপ সাধনা তাহলে ব্যর্থ? ওই বুড়ো লোকটা চন্দ্রাবতীকে সমবয়সী ভাবে! আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেখতে লাগলেন নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হেনা নামের একজোড়া ব্যঙ্গ চোখের চাহনি যে এই দেখাকে লক্ষ্য করছে আর মনে মনে বলছে, 'মরণ তোমার, বুড়ো উঠে যেতে না যেতেই আয়নার সামনে দাঁড়াতে এলে কি যৌবন দেখতে? অত দেখাদেখির দরকার কি? এমনিতেই তো বুড়ো মজে আছে। এখন শুধু কেলেঙ্কারীর অপেক্ষা!'

চন্দ্রাবতী সেটা টের পেলেন না, ভাবলেন কোথায় সেই ছায়া? কোথায় সেই ত্রুটি? কেমন করে দূর করা যায় সেই ছায়া, সেই ত্রুটি?

ফিকে নীল গঙ্গাজলী ডুরে, গাঢ় নীল রেশমী ব্লাউজ, নীল কাঁচের মালা, নীল কাঁচের বালা। হাল্কা চটির রঙটাও নীল ঘেঁষা।

সুন্দর একটি কাঁচের বাসনে সাজিয়ে নিলেন চন্দ্রাবতী কয়েকটি আলুর দম।

হ্যাঁ, আপাতত আলুর দমই। অল্প দিয়েই সুরু করা ভাল। হঠাৎ মাংসের গুলিকাবাব দেখলে হার্টফেল করে বসতে পারে লোকটা। আপাতত আলুর দম খেয়েই পা পিছলে আলুর দম হোক—মনে মনে হাসলেন চন্দ্রাবতী, তারপর শনৈঃ পন্থা।

হেনাকে কাজের ছুতো করে বাইরে পাঠিয়েছেন, বড় তীব্র চোখ হেনার। যেন ভিতরে কেটে বসে। ওটাকে ছাড়িয়ে দেবেন, বাচ্ছা একটা চাকর রাখবেন।

সিল্কের রুমাল ঢাকা দেওয়া বাটিটা নিয়ে নিজের দরজা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন চন্দ্রাবতী। পা-টা কেমন সিরসির করে উঠল। একেই কি পা কাঁপা বলে?

বলতে পারে, কিন্তু চন্দ্রাবতী এ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। চন্দ্রাবতী স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে জয় করতে বেরিয়েছেন। চন্দ্রাবতী একটা পরীক্ষার কাজে হাত দিতে চান। দেখতে চান খরগোশ হয়ে যাওয়া সিংহকে আবার সিংহতে ফিরিয়ে আনা যায় কি না! সেটাই জয় চন্দ্রাবতীর।

দৃঢ় পায়ে এগিয়ে ও ফ্ল্যাটের বেল টিপলেন।

যোশী সাহেব যদি বিহ্বল হয়ে তাকিয়েই থাকেন দু'দণ্ড, দোষ দেওয়া যায় না! বিহ্বলতা কাটতে সময় দিলেন চন্দ্রাবতী। তারপর মধুর একটু হাস্যের সঙ্গে বললেন, 'আজ আমি আপনার

সঙ্গে চা খেতে এলাম। এই আলু নিজে হাতে রান্না করে এনেছি আপনার জন্যে।'

'দিদি!' যোশী সাহেবের চোখে কৃতার্থমন্যের গদগদ ভঙ্গী!

সম্বলের মধ্যে ক'টা বেতের চেয়ার। চন্দ্রাবতী বিনা অনুরোধেই তার একটায় বসে পড়ে মৃদু হেসে বলেন, 'আচ্ছা যোশী সাহেব, আমাকে কি আপনার থেকে বয়সে বড় বলে মনে হয়?'

এ কী প্রশ্ন! যোশী সাহেবের পক্ষে পা পিছলে আলুর দম হওয়ার যোগ্যই প্রশ্ন যে!

'কেন, কেন,' যোশী সাহেব ব্যস্ত গলায় বলেন, 'একথা বলছেন কেন দিদি?'

'ওই তো ওই জন্যে,' চন্দ্রাবতী সূক্ষ্ম কাজল-টানা চোখে একটু মিষ্টি চাওয়া চেয়ে বলেন, 'আপনার ওই ডাকের জন্যে! নিশ্চয় আপনি খুব বুড়ি ভাবেন, তাই দিদি ডাকেন আমায়।'

'আহা-হা! ছি ছি!' যোশী সাহেব শিউরে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, 'বুড়ি ভাবব আপনাকে? আপনার সম্মান সম্ভ্রমের মুখ চেয়েই দিদি ডাকি।'

'না,' চন্দ্রাবতী আদুরে গলায় বলেন, 'বলতে পাবেন না আর। খুব রেগে যাই আমি। নিজেকে ভারি বুড়ি বুড়ি লাগে।'

বধ হয়ে যান যোশী সাহেব। যোশী সাহেবকে বধ করতে আর কতই বা ধারাল অস্ত্রের আবশ্যক?

'দিদি' ডাকের জন্যে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি আকুল প্রশ্ন করেন, 'কি তবে বলবো অতঃপর?'

'কেন? নাম ধরবেন। স্রেফ নাম। চন্দ্রা বলবেন। আমার নাম চন্দ্রাবতী।'

যোশী সাহেব যেন হোঁচট খেলেন। মূর্ছা যেতে যেতে রয়ে গেলেন। তারপর হাতযোড় করলেন, 'ও আদেশ করবেন না। বরং মিসেস দত্ত বলব।'

'মিসেস দত্ত !' চন্দ্রাবতী একটু করুণ হাসি হাসেন। 'আমার কাছে ও পরিচয়টা ব্যঙ্গ মাত্র মিস্টার যোশী !'

যোশী সাহেব মাথা নীচু করেন। বিষণ্ণ গলায় বলেন, 'বড় আশ্চর্য লাগে, বড় আশ্চর্য লাগে ! আপনার মতো স্ত্রীকে ফেলে কি করে উনি—'

চন্দ্রাবতী এই আবেগের গলাকে বাধা দেন। হেসে উঠে বলেন, 'আমারও ঠিক ওই রকমই আশ্চর্য লাগে মিস্টার যোশী ! আপনার মতো স্বামীকে ইয়ে করে মিসেস যোশী কি করে স্যুইসাইড করলেন !'

জয় করতে কি অনেক সময় লেগেছিল ?

ফিরে এসে সোফায় ঠেস দিয়ে ভাবতে থাকেন চন্দ্রাবতী। 'দিদি' শব্দ তো আর একবারও উচ্চারণ করেননি ভদ্রলোক। আলুর দম খেয়ে মূর্ছাহত হয়ে গেছেন, এবং এ রকম রান্না খেতে পেলে যে বেঁচে থাকবার স্পৃহা জাগে সে কথা স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া ? আরও কিছু নয় ?

চন্দ্রাবতীর অনুরোধে আবার বন্দুক কিনতে রাজী হননি যোশী সাহেব ? চন্দ্রাবতী যদি রেঁধে খাওয়ান—মাছ মাংস খেতে রাজী হননি ? বলেননি কি, 'কেউ আমার জন্যে ভাবছে, আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হচ্ছে, আমাকে মানুষের মতো দেখতে চাইছে, এমন কথা জানতে পারলে জীবনের আবার নতুন মানে খুঁজে পাওয়া যায় মিসেস দত্ত !'

চন্দ্রাবতীর ফ্ল্যাটে যোশী সাহেবের একশো দিন আসাতেও যে অন্তরঙ্গতা না হয়েছিল, যোশী সাহেবের ফ্ল্যাটে চন্দ্রাবতীর একদিন যাওয়াতে তার একশো গুণ হয়ে গেল।

তাই হয়। সেটাই স্বাভাবিক।

মেয়ে মন যখন নিজে থেকে অগ্রসর হয়, সে তো ব্যর্থ হয়ে ফিরে

আসবে বলে হয় না। আর সেই অগ্রসরতাটুকুই পুরুষ চিত্তকে বিগলিত করে ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট।

আর ও চিত্ত তো বিগলিতই ছিল। শুধু মনকে চোখ ঠারছিল, শুধু দিদি ডেকে নিজেকে ভোলাচ্ছিল।

চন্দ্রাবতী সেই আত্মপ্রতারণার আবরণটুকু খুলে দিয়েছেন। তার অস্পষ্ট চিত্তের উপর টর্চের আলো ফেলেছেন।

'কই, আপনার পদ্মার আঁকা ছবি দেখালেন না?' অভিমান-ভরা গলায় অভিযোগ করেছিলেন চন্দ্রাবতী।

যোশী সাহেব আর অন্য দিনের মতো উৎফুল্ল হননি, একটু যেন কুণ্ঠিত গলায় বলেছিলেন, 'সে এমন কিছু নয়।'

'বাঃ, এখন ও-কথা বলে ভোলালে চলবে কেন? ছবি দেখতেই তো এলাম।'

যোশী সাহেব সঙ্কুচিত ভাবে নিজের শয়নঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রাবতীকে, দেওয়ালে ঝোলান কয়েকটি মামুলি নিসর্গ চিত্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়েছিলেন, 'ওই সেই জঙ্গলের ছবি, যেখানে আমি—এই নদীটা ওখান থেকে মাইল কয়েক দূরে, এ ঝরণাটা পাহাড়ের কোলে—বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল একদিন।'

'তার মানে জায়গাটাকে উনি ভালবেসে ফেলেছিলেন,' চন্দ্রাবতী বলেছেন, 'নইলে এমন করে তুলির আগায় অমর করে রাখতে চাইতেন না।'

যোশী সাহেব অন্যমনা ভাবে বলেন, 'কি জানি!'

যোশী সাহেবের চোখ থেকে অতীতের ধূসর ছায়া বুঝি সরে যাচ্ছিল, মৃত যোশী সাহেব আবার বুঝি জীবন্ত জগতের দিকে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছেন।

নির্জন এই বাসাটার এক প্রান্তে একক এক পুরুষের শয়নকক্ষে তার বিহ্বল দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে চন্দ্রাবতী অটল আছেন? স্থির আছেন? এখন আর চন্দ্রাবতীর বুক কাঁপছে না? পা কাঁপছে

না? লোকচক্ষুর ভয় করছে না? যে লোকচক্ষু অদৃশ্য থেকেও পিঠে ছুরি বসায়, বুকে কাঁটা বেঁধে?

করছে, করছেই। তবু চন্দ্রাবতী যেন মরণ-পণ করে স্বচ্ছন্দের ভূমিকা অভিনয় করছেন। এত কি? চন্দ্রাবতীর কি বয়েস হয়নি? কারও সঙ্গে সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলবার অধিকার হয়নি এখনও?

হ্যাঁ, ওই কথাই ভাবেন এখন চন্দ্রাবতী। বয়সের কথা।

কিন্তু একা কি চন্দ্রাবতীই? মানুষ মাত্রেরই তো এই ধর্ম। সুবিধে অনুযায়ী যুক্তি খাড়া করা, আপন অনুকূলেই শুধু চিন্তা করা। অতএব চন্দ্রাবতীর পক্ষেও আশ্চর্য নয় এ কথা ভাবা—আমি কি কচি খুকি?

কিন্তু এখন ঘরে ফিরে এসে একা বসে ভাবছেন, শুধু এইটুকু? এইটুকুর জন্যে এত আয়োজন করলাম আমি? যাকে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারা যায়, তার জন্যে কামান সাজালাম?

যাক, জয়টা হলো। যোশী সাহেবের ওই বর্তে যাওয়া ভঙ্গী যে আর দু'দিনেই প্রেম-নিবেদনে গদগদ হয়ে উঠবে, সে তো চোখের উপরই দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু তাতে লাভটা কি হলো? চন্দ্রাবতী কি নিশিকান্ত আর তার বোনের উপর প্রতিশোধ নিতে সেই প্রেম গ্রহণ করবেন?

চন্দ্রাবতীর চিন্তায় ছেদ পড়ল। হৈ চৈ করে এসে ঢুকল চন্দ্রাবতীর এক মামাতো ভাসুরপো আর তার এক বান্ধবী। সুকান্ত আর পম্পা।

এই ভাবেই আসে ওরা। প্রেম করছে, না দিগ্বিজয় করছে বোঝা শক্ত।

'কাকীমা, চা নয়, কফি।' বলতে বলতে ঢুকল সুকান্ত।

চন্দ্রাবতী চিন্তার গভীর থেকে নিজেকে তুলে আনলেন, নিজ

স্বভাবে ফিরে এলেন, হেসে উঠে বললেন, 'চা-ও নয়, কফিও নয়, ঘোড়ার ডিম! কাকীমা, চা নয় কফি! আমি তোকে নেমন্তন্ন করে রেখেছি?'

পম্পাও তার বন্ধুর মতোই স্বচ্ছন্দে বলে ওঠে, 'নিশ্চয়! আপনার কাছে তো আমাদের চির নেমন্তন্ন। সরি, নিমন্ত্রণ।'

চন্দ্রাবতী লীলাভরে সোফার কুশন তুলে লোফালুফি করতে করতে বলেন, 'ওরে সর্বনেশে মেয়ে, এই রকম ডাকাত তুমি! এই সুকান্ত, আমার কিসের দায় পড়েছে রে, যে, তোকে আর তোর এই ধিঙ্গী বান্ধবীকে চিরন্তন নিমন্ত্রণ দিয়ে রাখব আমি? না বাপু না, আমার পয়সা অত সস্তা নয়।'

'আপনি একটি কিপ্টের হাড়,' সুকান্ত বলে ওঠে, 'দিন দিন আরও কেপ্পনি বাড়ছে। পম্পা ওঠ, দেখো কোথায় কি লুকোন আছে। ভাঁড়ার তচনচ করে বার করে আনো।'

পম্পা হি হি করে হাসে, 'খুঁজে কি আর পাওয়া যাবে? হয়তো গডরেজের আলমারিতেই তোলা আছে।'

'তা থাকবেই তো,' চন্দ্রাবতী আলো ঝলসান চোখে বলে ওঠেন, 'তোদের মতো দস্যুদের কবল থেকে বাঁচাতে তাই রাখা দরকার। কফির আবদার রাখ, বাসি মুড়ি আছে কৌটোয়, খাবি তো খা।'

'তাই তাই।' সুকান্ত বলে, 'পেটে খাণ্ডব দাহন হচ্ছে, এখন যা জুটবে তাই—'

'এমন লক্ষ্মীছাড়ার অবস্থা কেন?' চন্দ্রাবতী হেসে গড়ান, 'এই দজ্জাল মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করে বোধ হয়? কপালে দুর্গতি আছে আর কি!'

ওরা হেসে খান খান হয়।

ওরা কেড়ে-কুড়ে কফি খায়, বিস্কিট খায়, জেলি খায়, আচার খায়, আর সবশেষে একমুঠো করে ভাজা মশলা নিয়ে চিবোতে থাকে।

এই পদ্ধতি ওদের। সুকান্ত আর তার বান্ধবীর।

অথবা আরো অনেকের, যেমন চন্দ্রাবতীর নিজের খুড়তুতো বোনের দেওর অম্বরীষ, চন্দ্রাবতীর জায়ের ভাইপো ইন্দ্রনীল, চন্দ্রাবতীর ননদের ভাগ্নী সুকন্যা, আর ভাসুরঝি মণিমালা। পরিধি আরো বাড়ে, ওদের বন্ধুরা আর বান্ধবীরাও আসে ওদের সঙ্গে। চন্দ্রাবতী এই ভাবেই আদর বাড়ান।

চন্দ্রাবতী কি শুধু ওদের ভালবেসেই এমন করে প্রশ্রয় দেন? না কি ওদের কাছেই চন্দ্রাবতীর আশ্রয়? এই সবুজ সতেজ তারুণ্যের সংস্পর্শ থেকেই কি প্রাণরস আহরণ করতে চান চন্দ্রাবতী?

ভাজা মশলা চিবোতে চিবোতে অলস ভাবে বলে সুকান্ত, 'ভক্তিমতীর বাড়িতে যে বিয়ে লাগছে গো!'

টুনিকে ওরা ভক্তিমতী বলেই উল্লেখ করে। এবং ওর সম্পর্কিত কথা প্রায়শঃই কৌতুকের সুরে বলে।

চন্দ্রাবতী ভুরু কুঁচকে বলেন, 'বিয়ে? বিয়ে আবার কার?'

'কেন, ভক্তিমতীর বড় পুত্তুরের!'

'ও মা!' চন্দ্রাবতী ছেলেমানুষের মতো উছলে ওঠেন, 'সেটা আবার এত লায়েক হলো কখন?'

'হলো! হওয়ালেই হয়। পাত্রী ভক্তিমতীর গুরুভগ্নীর মেয়ে, গুরুর ঘটকালি—'

চন্দ্রাবতী অবিশ্বাসের সুরে বলেন, 'তুই এত কথা জানলি কি করে? আমি তো এই দু'তিন দিন গেলাম। কই, কিছু শুনলাম না তো!'

'আপনি?' সুকান্ত হেসে ওঠে, 'আপনি জানবেন মানে? আপনি পাছে জেনে ফেলেন অথবা যদি জানতে পারেন, এই ভয়ে ভদ্রমহিলা ত্রস্ত-ব্যস্ত অস্থস্থ। আমাকে বার বার করে বলে দিয়েছেন, যেন আপনার কানে না তুলি!'

'যেন আমার কানে না তুলিস!' চন্দ্রাবতী তার মাথায় একটা

চাঁটি মেরে বলেন, 'আর তুমি শয়তান বিশ্বাসঘাতকতা করছ বসে বসে ?'

'উপায় নেই, এত বড় একটা জোর খবর! কনের রং নাকি ছাতার কাপড়ের মতো, আর লেখাপড়ায় নাকি মা জননী—'

'ও বুঝেছি, তাই আমায় বলেনি। জানে তো আমি স্পষ্টবক্তা, বলে বসব কিছু। যাক, তাহলে মেয়ের কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে শাশুড়ীর গুরুভগ্নীর কন্যা!'

'তাই দাঁড়াচ্ছে। তবে আমার ও বিয়েতে ইন্টারেস্ট নেই, শুনছি নাকি ধোঁকার ডালনা আর রাধাবল্লভী!' দুটো হাত উল্টে কায়দা করে সুকান্ত।

চন্দ্রাবতী হেসে বলেন, 'তা যে বিয়েতে তোর একশো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট, সে বিয়েটায় এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?'

'জিগ্যেস করো,' পম্পার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে সুকান্ত, 'সামনেই তো রয়েছে—'

'ও কি বলবে?'

'ও-ই তো বলবে! আপত্তি তো ওরই!'

'আপত্তি!' চন্দ্রাবতী বিস্মিত গলায় বলে ওঠেন, 'বিয়েতে ওর আপত্তি?'

'আহা, বিয়েতে কেন আপত্তি হবে?' পম্পা আদুরে গলায় বলে, 'আপত্তি তাড়াতাড়িতে। বিয়ে মানেই তো বিধি-নিষেধের পাকে বাঁধা পড়া। এ বাবা কেমন চরে বেড়াচ্ছি—'

চন্দ্রাবতী হঠাৎ যেন ধূসর হয়ে যান। মেয়েটার মুখের দিকে তাকান। অবলীলায় বলল ও এ কথা! লজ্জা হলো না, ভয় হলো না।

বিয়ে হলে বন্ধনে পড়ব, এ বাবা বেশ আছি, চরে বেড়াচ্ছি—বলছে পম্পা! তার মানে এই হচ্ছে মনোভাব এ যুগের মেয়েদের।

কিন্তু শুধু এ যুগের মেয়েদের দোষ দিলেই বা চলবে কেন?

সব যুগের মেয়েদের আর ছেলেদের-ই কি এই মুক্তির বাসনা নেই? বেশ চরে বেড়াব—এই চিন্তা নিয়ে নিশিকান্ত ঘর ছাড়েনি?

দিব্যি বেশ চরে বেড়াব ভেবে টুনি ঠাকুর পায়নি?

হ্যাঁ তাই, তাই! তাছাড়া আর কিছু নয়। ওই ঠাকুর পাওয়া-টাওয়াগুলো স্রেফ একটা হাতিয়ার, সমাজের আইন অস্বীকার করে যথেচ্ছ বিচরণের একটা ছাড়পত্র! সেই ছাড়পত্র সংগ্রহ করেছে নিশিকান্ত, আর তার বিধবা বোন।

চন্দ্রাবতীর ওই পাশপোর্ট নেই, তাই চন্দ্রাবতীকে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে।

চন্দ্রাবতীও ইচ্ছে করলেই ও রকম একটা ছাড়পত্র জোগাড় করে ফেলতে পারেন। এমনিতেই খাটো চুল আর আঁটো ব্লাউজের পরিবেশেও চন্দ্রাবতীকে না কি দেবীর মতো দেখতে লাগে। চন্দ্রাবতী যদি সেই দেবী মূর্তিতে আর একটু দিব্যভাবের পালিশ চাপান, চন্দ্রাবতী যদি—'ইহলোক তুচ্ছ, পরলোকই সব' গোছের ভূমিকা নিয়ে ওদের ওই মঞ্চে গিয়ে ওঠেন, অনায়াসেই ওদের উপর টেক্কা দিতে পারেন চন্দ্রাবতী।

কিন্তু চন্দ্রাবতী তা করতে যাবেন না। চন্দ্রাবতী ওদের অবজ্ঞা করেন, করুণা করেন। ওরা ভোগের মধ্যে ভগবানকে দেখতে পায় না, ওদের ভগবান শুধু দুর্ভোগের মধ্যেই বিরাজিত। এ ভেবে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন।

ওই তো ওই টুনির ঠাকুরই তো সেদিন খুব ব্যাখ্যা দিলেন ভগবানের।

আনন্দই ভগবান, আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দই পরমা-প্রকৃতি। আরো কত কি! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা। ব্রহ্মই বা কে, ভগবানই বা কে! সে যাক্। আনন্দই যে ঈশ্বর এই তো বক্তব্য?

তবে?

চন্দ্রাবতী যদি ভোগের মধ্যে আনন্দ পান, যদি নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে বাস করতে আনন্দ পান, সুন্দর ভাবে কথা বলে, সুন্দর ভঙ্গীতে হাঁটা-চলা করে, সুন্দর ছন্দে হেসে আপনাকে নিয়ে আপনি বিভোর থাকতে আনন্দ পান, ভগবানের পূজো করছি ভাবতে দোষ কি ?

উঁহু। তা হবে না।

ভগবানকে পেতে হলেই তোমাকে কৃচ্ছ্রসাধনের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। দীন-দুঃখী সাজতে হবে, দৈন্য আর ক্লেশকে জীবনে বরণ করে নিতে হবে, ভাঁড়ার ঘরের কোণে স্বপাকের হবিষ্যির পিণ্ডি খেতে না পারলে কিছুতেই ভগবানের কাছে পৌঁছান যাবে না। ভগবানকে ভালবাসতে ইচ্ছে হলেই সব মানুষকে ছোট ভাবতে হবে, নিকৃষ্ট ভাবতে হবে, হেয় ভাবতে হবে।

টুনিদের আর টুনির দাদাদের ওই ভগবানে রুচি নেই চন্দ্রাবতীর। তিনি তাঁর নিজের আনন্দের পদ্ধতি নিয়েই থাকবেন। আর থাকবেন ওদের মতো নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে দাপটের উপর।

একজন মুগ্ধ পুরুষ যদি চন্দ্রাবতীর দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়, চন্দ্রাবতী ভয়ে কাঁটা হবেন না। চন্দ্রাবতী যদি একটা মজে যাওয়া নদীকে পুনঃ প্রবাহিত করতে পারেন, সেটাকে বাহাদুরী বলেই মনে করবেন, পাপ বলে নয়।

চন্দ্রাবতী আপন পদ্ধতিতে দৃঢ় হলেন।

চন্দ্রাবতী খাল কেটে কুমীর আনলেন।

চন্দ্রাবতী কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখালেন।

যোশী সাহেব ক্রমশই জীবন্ত হয়ে উঠছেন। যোশী সাহেব আর শুধু অপরাহ্ণের সোনালী আলোয় বসে দু'দণ্ড গল্প করেই ক্ষান্ত হতে চাইছেন না। বেড়াতে নিয়ে যেতে চান, নিয়ে যেতে চান স্টীমার ট্রিপে।

অর্থাৎ মরা নদীতে বান ডাকিয়েছেন চন্দ্রাবতী।

অথচ কতটুকুই বা কি করলেন মহিলা? শুধু দু-চার দিন ভাল করে রেঁধে খাওয়ানো, শুধু দু-চার বার বলা—'জীবন জিনিসটা কি এতই সস্তা যোশী সাহেব, যে কোন একজনের বুদ্ধিহীনতার খেসারৎ দিতে অপর একজন জীবনটাকে বিকিয়ে দেবে? এই পৃথিবী কত যুগ-যুগান্তরের, কত কোটি বৎসরের, তবু জরাগ্রস্ত বৃদ্ধা সে নয়। আজও তার কত রূপ, কত রঙ, কত রস—আজও তাতে আলোর সমারোহ! মানুষ কি তার পৃথিবীর কাছে শিখতে পারবে না কিছুই? সে শুধু একটা ধাক্কায় ভেঙে পড়বে, টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে?

অথচ যাবার কথা নয়। ভালবাসবার এবং ভালবাসা পাবার স্পৃহা মৃত্যুক্ষণ পর্যন্তই থাকে প্রতিটি মানুষের।'

হয়তো এইটুকুই। এমনি দু-চারটে কথা জায়গা বুঝে বলে ফেলা। তাতেই যোশী সাহেব সচেতন হচ্ছেন, উন্মাদনা অনুভব করছেন, আবার নতুন করে রূপ রঙ রসের সন্ধান করছেন।

চন্দ্রাবতীরই বা মন্দ কি? স্টীমারে ফ্রেজারগঞ্জ বেড়াতে যেতে কে ডাকছে চন্দ্রাবতীকে? মোটরে দীঘা? কে কখন চন্দ্রাবতীর জন্যে সিনেমা-থিয়েটারের সবচেয়ে দামী আসনের টিকিটটি কিনে রেখে ভিক্ষুকের আবেদন নিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে?

চন্দ্রাবতী আপত্তি জানালে কে নিভে যাওয়া প্রদীপের মতো মলিন হয়ে যাচ্ছে, আর চন্দ্রাবতী সম্মতি জানালে কার মুখে হাজার বাতির আলো জ্বলে উঠছে?

চন্দ্রাবতীর ওই অনুরক্ত ভক্তরা এসে আবদার করে, জ্বালাতন করে, আদর কাড়িয়ে সুবিধে-সুযোগ আদায় করে নেয়, কিন্তু কবে কোন্‌দিন বলে—তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে?

তা বলে না। চন্দ্রাবতীকে দিয়ে ওদের সুবিধে আছে, চন্দ্রাবতীকে নিয়ে ওদের সুখ নেই।

নব উন্মাদনায় উন্মত্ত যোশী সাহেব চন্দ্রাবতীকে নিয়ে সুখ পাচ্ছেন, তাই বার বার চন্দ্রাবতীর দরজায় ছুটে আসছেন।

পাড়ার লোকরা কী বলছে টের পাচ্ছেন চন্দ্রাবতী। অনুমান করেই শুধু নয়, দূত মারফৎ। আরো পাঁচজনে বেচারী চন্দ্রাবতীর নামে কি মিথ্যা কুৎসা দিচ্ছে এবং সে তাতে মর্মাহত হচ্ছে তা বোঝবার জন্যে প্রায়ই আসছে কেউ না কেউ। সকলের সব কথাগুলি বলে যাচ্ছে চন্দ্রাবতীকে, সকলের সব মন্তব্য।

এ যাবৎকাল ডুবে ডুবে জল খেয়ে এইবার যে চন্দ্রাবতী স্বরূপে বিকশিত হচ্ছেন, এবং চন্দ্রাবতীর এই রূপ যে সকলে বরাবরই অনুভবে দেখেছেন, এ-কথা শুনিয়ে যায় তারা মর্মাহতের ভূমিকা নিয়ে। আরো অনেক কিছুই শুনিয়ে যায়।

চন্দ্রাবতী এই রাজসাক্ষীদের প্রতি করুণা-কটাক্ষ করেন মাত্র, কখনো উত্তেজিত হন না। তাই ওরা বিরক্ত হয়ে উঠে যায়।

চন্দ্রাবতী পাড়ার নাকের সামনে দিয়ে যোশী সাহেবের সঙ্গে গাড়িতে উঠে সাঁ করে বেরিয়ে যান। চন্দ্রাবতীর সেই নিজের গাড়ি অবশ্য নয়, ট্যাক্সি, তবু তাই বা মন্দ কি? গতি তো আছে তাতেও।

নতুন রসে বিভোর যোশী সাহেব এখন বেপরোয়া খরচ করছেন, আর সেই খরচ চন্দ্রাবতীকেই কেন্দ্র করে।

কেন ফেলে দেবেন চন্দ্রাবতী ভাগ্যের এই দানকে? চন্দ্রাবতী কি এইটুকুতেই খারাপ হয়ে যাচ্ছেন?

তবে আর একটু আয়োজন করতে পেলে যেন ভাল হতো! তোড়জোড় করে বাঘ শিকার করতে বেরিয়ে যদি দেখা যায় বাঘটা আগেই মরে রয়েছে, সুখ কোথায়? বড় জোর মরা বাঘটা টেনে নিয়ে গিয়ে সমাজে বাহাদুরী দেখানো যায়।

তাই দেখাচ্ছেন চন্দ্রাবতী।

নাইলন শাড়ির হালকা আঁচল দুলিয়ে শ্যাম্পু করা চুল উড়িয়ে

যোশী সাহেবের পাশে উঠে বসছেন পাড়ার লোকের নাকের সামনে দিয়ে।

হঠাৎ একদিন ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। চন্দ্রাবতীর ননদ এলেন চন্দ্রাবতীর ফ্ল্যাটে। ছেলের বিয়ের নেমন্তন্নর কারণেই নিশ্চয়। কিন্তু নিজে আসবেন তিনি এটা অপ্রত্যাশিত অভাবনীয়।

এসেছেন একা। আর ঠিক সেই সময় চন্দ্রাবতী আর যোশী সাহেব নামছেন গাড়ি থেকে। সারাদিন ডায়মণ্ড হারবারে বেড়িয়ে এসে।

ননদ বোধকরি একটু থতমত খেলেন, তারপর কঠোর কঠিন হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

চন্দ্রাবতী উছলে উঠলেন, চন্দ্রাবতী প্রগলভ্ হলেন, চন্দ্রাবতী একেবারে হৈ চৈ করে বলে উঠলেন, 'আরে কী ব্যাপার! পৃথিবী ঠিক পথে চলছে তো? না কি গতিপথ বদলে ফেলেছে? তুমি এই পাপীয়সীর বাড়িতে! চল চল। মিস্টার যোশী, গুড বাই! ইনি হচ্ছেন আমার একটি প্রিয় বান্ধবী। অনেকদিন পরে এসেছেন—'

অপ্রতিভ যোশী সাহেব কি করবেন ভেবে পান না।

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্তে!' দু-দুটো নমস্কার করে ফেলে প্রায় পালিয়েই যান যোশী সাহেব।

চন্দ্রাবতীর এই ম্লেচ্ছাচারের বাড়িতে কোন্‌খানটায় বসবেন তাকিয়ে দেখে খুঁজে পান না ননদ। নাক কুঁচকে তীব্রস্বরে বলেন, 'মাটিতে তো পা রাখতে বিঘ্নি আসছে, আসন পেতে বসব তার জো কি! বলি তোমার সব সৃষ্টিই কি ন্যাকড়া মোড়া?'

চন্দ্রাবতী হেসে উঠে বলেন, 'কাষ্ঠাসন তো সবগুলোই, আরামের জন্যে গদি মোড়া!'

'ওই আরামই কর বসে বসে! ওতেই মরলে!' ননদ দেখে-

শুনে একটা জানলার ধাপে আলগোছে একটু বসে নাক সিঁটকে বলেন, 'লোকটা কে ?'

চন্দ্রাবতী রুক্ষ চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে চালিয়ে সেটা আরো ফাঁপিয়ে তুলতে তুলতে মৃদু হেসে বলেন, 'বন্ধুলোক, এই আর কি !'

'হুঁ। যা শুনতে পাচ্ছি তা মিথ্যে নয় তাহলে ! গলায় দড়ি সেজবৌ, গলায় দড়ি, সন্ধ্যেবেলায় ময়লা মাড়িয়ে মরলে তুমি ? বুড়ো বয়েসে স্বভাব খারাপ করলে ?' ননদ একটু দম নেন, তারপর আবার উদ্দীপ্ত হন, 'অবিশ্যি বুড়ো বয়সেই বা বলব কি ? চিরকালই তোমার মতি-গতি কুপথে ! সাধে আর সেজদা বিবাগী হয়েছে !'

'ও মা সে কি গো !' চন্দ্রাবতী হেসে উঠে বলেন, 'তবে যে সেদিন তোমার কোন্ এক গুরু ভগ্নীকে বলছিলে, ভাই আমার তীব্র বৈরাগ্যের বশে সংসার ত্যাগ করে সাধন-ভজন করছেন ! কই বললে না তো গিন্নীর জ্বালায়—'

'চুপ কর সেজবৌ, চুপ কর ! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। ওই একটা পাঞ্জাবী মিন্সের সঙ্গে ঢলাঢলি করছ তুমি ? লজ্জা হচ্ছে না ? ঘেন্না হচ্ছে না ? বয়সের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হচ্ছে না ? প্রবৃত্তিকে বলিহারী যাই সেজবৌ, প্রবৃত্তিকে বলিহারী ! বিশ বছর ঘর করেছ না তুমি সেজদার সঙ্গে ?'

চন্দ্রাবতী খুব মোলায়েম গলায় বলেন, 'উনিশ বছর চার মাস।'

ননদ উঠে দাঁড়ালেন। তীব্র গলায় বলেন, 'যাক্ আর দরকার নেই, তোমার ন্যাকরা শুনতে আসিনি আমি। লোকমুখে নানাকথা শুনতে পাচ্ছি, বিশ্বাস হচ্ছিল না, ভাবছিলাম তাই কি সম্ভব ? মানুষ কি জন্তু-জানোয়ার ? সে অহঙ্কার ভাঙল !'

চন্দ্রাবতী নিরীহ গলায় বলেন, 'তুমি তা'হলে সরেজমিনে তদন্ত করতে এসেছ ? আমি বলি হঠাৎ বুঝি ভাগ্য ফিরলো আমার।'

'তোমার ভাগ্য ফেরাবো আমি ?' ননদ তীব্র গলায় বলেন,

'তোমার বলে কত ভাগ্যি। এখনো এই বুড়ো বয়সে, লোকে তোমায় দেখে মজছে।'

'তা যা বলেছ—' চন্দ্রাবতী অমায়িক গলায় বলেন, 'দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাই। ওই তো দেখলে তো ওই ভদ্রলোককে। পাগল করে মারছে। ওর সঙ্গে বেড়াতে চলো, ওর সঙ্গে সিনেমায় চলো ; এড়াবার জো নেই। কী বিপদ তা' বলো।'

'বিপদ!'

রাগে মুখটা আগুন হয়ে ওঠে ননদের, এটা যে ইচ্ছাকৃত অপমান বুঝতে বাকি থাকল না তাঁর, বলে উঠলেন, 'গায়ে পাঁক মেখে লোককে দেখিয়ে বেড়ায় পাগলে, সহজ মানুষে নয়। বুঝলে সেজবৌ, ওর মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই। সাতজন্মে তোমার বাড়ি আসি না আমি, আসতে প্রবৃত্তিও হয় না, তা এসে পড়ার শাস্তিটা দিলে ভাল। তোমার এই সংসারের ভেতর বার সবই অশুচি সেটা তুমিই জানিয়ে দিলে। গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরতে হবে আমায়।'

চন্দ্রাবতী আরো নিরীহ গলায় বলেন, 'তাহলে গোপালের বিয়েতে আমার নেমন্তন্ন বাদ? আর আমি কি না আহ্লাদে ভাসছি, ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এই ম্লেচ্ছ বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়ল তোমার!'

ননদ একটু থতমত খান। তিক্তগলায় বলেন, 'তাই ইচ্ছে ছিল। ভেবেছিলাম সত্যিই কি এমন হবে? সত্যিই কি আর এমন করে মুখ পোড়াচ্ছ তুমি? ও সব লোকের রটনা! তা হাতেহাতেই প্রমাণ দিলে তুমি! কী আর বলব! এদিকে কত সাধ্য-সাধনা করে সেজদাকে বৃন্দাবন থেকে আনাচ্ছি।'

'সেজদাকে বৃন্দাবন থেকে!'

চন্দ্রাবতী কি একটু কেঁপে ওঠেন? চন্দ্রাবতীর মুখটা কি অত রঙ মাখা সত্ত্বেও বিবর্ণ দেখায়? হয়তো, হয়তো বা নয়।

তারপর কিন্তু চন্দ্রাবতী হেসে ওঠেন। বলেন, 'তাই নাকি?

মালপো ভোগটা ভাল করেই দেবে তাহলে ? তা সন্নিসীদের এ সব বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসতে আছে ?'

ননদ ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'নেমন্তন্ন খেতে আসছে না কেউ। বড় বাবাজী আসছেন বৃন্দাবন থেকে, সেই সঙ্গে প্রধান প্রধান শিষ্যরা আসছেন, একটি দিন সবাইকে সেবা নিতে বলেছি আমার কাছে।'

'ও! তোমার সেজদা বুঝি প্রধানদের একজন ?'

'তা নয় তো কি! আশা ছিল এই বিয়ে বাড়ির ছুতোয় দু-জনের যদি একবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। যদি তোমার মতি ফেরে।'

'ওমা সত্যি ?'

চন্দ্রাবতী যেন আহ্লাদে উছলে ওঠেন, 'তুমি যে সেই সেকালের ঠানদিদের মত করতে চাইছো গো! সেকালে করত না বুড়িরা ? লাজুক বর-কনেকে কোনো কৌশলে একটা ঘরে শেকল তুলে দিতো। এই তোমাকেই তো রাঙাঠানদি নাস্তা-নাবুদ করেছিলেন মনে নেই ? ঠাকুর জামাইকে ভুলিয়ে ডেকে এনে—'

ননদ বেজার গলায় বলেন, 'মরা মানুষকে নিয়ে আর কেচ্ছার দরকার নেই সেজবৌ। সেজদা আসছেন সেই খবরটা দিলাম। ভাবলাম যদি এতটুকু পরিবর্তন এসে থাকে। যদি অনুতাপ এসে থাকে।'

'অনুতাপ ?'

চন্দ্রাবতী হেসে ওঠেন, 'পাপ-টাপ কিছু করলাম না, খামোকা অনুতাপই বা হতে যাবে কেন ?'

'পাপ নয়, বলে লোককে চোখ রাঙানো যায় সেজবৌ, মনকে চোখ ঠারা যায় না।' ক্রুদ্ধ ননদ বলেন, 'কার টাকায় আর কিসের টাকায় যে তোমার এই ঠাট-বাট বজায় রেখে সংসার চালাও, তা তুমিই জানো! তবে যার বুদ্ধি আছে সে ঠিকই বুঝতে পারে!… তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনো তুমি নতুন করে ঘর সাজাচ্ছো—এখনো তোমার বাসনার নিবৃত্তি হয়নি। নতুন করে

আরো নরকে ডুবছ! সময়ে একটা ছেলে হলে, আজ তুমি নাতি-পুতির ঠাকুরমা হতে সেজবৌ!'

চন্দ্রাবতী এবার সহসা গম্ভীর হলেন। গম্ভীর গলায় বলেন, 'তোমার যা যা বলবার বলা হয়েছে? না আরো কিছু বাকী আছে?'

'নাঃ, আর কিছু বলার নেই। বলতে প্রবৃত্তিও নেই—' ননদ ওঠেন। 'তোমাকে আর কিছু বলার নেই আমার। শুধু আমার ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা করছি তে-রাত্তিরের মধ্যে যেন মরণ হয় তোমার। এই কলুষ-কালিমা কামনা-বাসনার হাত থেকে অব্যাহতি পাও তুমি।'

চন্দ্রাবতী আবার হাসলেন। বললেন, 'সে কী গো, তোমার ঠাকুরের কাছে তুমি নিজের মুক্তি প্রার্থনা না করে এই পাপী-তাপী অধমের জন্যে প্রার্থনা করবে?'

'আমার মুক্তির জন্যে ভাবি না—' ননদ তীব্র গলায় বলেন, 'যাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছি, তিনিই সে ভার নিয়েছেন। উঃ, সেজদার মতো মানুষের সঙ্গে দু-যুগ কাটিয়ে তুমি—'

ননদ সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান তরতরিয়ে।

চন্দ্রাবতীও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নামেন।

মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন, 'তা সেই মহাপুরুষটি তো আর তে-রাত্তিরের মধ্যে আসছেন না? না কি আসছেন?'

ননদ ঘুরে দাঁড়িয়ে কঠোর গলায় বলেন, 'তার মানে? কেন?'

'তে-রাত্তিরের মধ্যে মরার অর্ডার হয়ে গেছে, একবার মহাপুরুষের চরণটা দর্শন করে মরতাম, এই আর কি!'

ননদ ভস্ম-করা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'সে পুণ্য থাকলে তো! আর আমার অর্ডারেই তো মরছ না সত্যি। এখনো চোখে কাজল আর ঠোঁটে রঙ দিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করো দু'দিন। তারপর গলে খসে মরো!'

চন্দ্রাবতী বলেন, 'আহা টুনি, তোমাদের ঠাকুর কি মহিমময়, কত উঁচুতে তুলেছেন তোমাদের! দেখছি আর ভাবছি।'

ননদ আর কথা বলেন না। দাঁড় করিয়ে রাখা ট্যাক্সিতে উঠে বলেন, 'চালাও।'

'আই সি! উনি আপনার স্বামীর ভগ্নী?' যোশী সাহেব বলেন, 'তাই ভাবছি কাল থেকে, উনি যদি আপনার বান্ধবী তো এমন ক্রুদ্ধ ভঙ্গী কেন?'

সকালবেলাতেই এসেছেন যোশী সাহেব। যোশী সাহেবের সাজ-সজ্জায় যত্নের ছাপ। নবপ্রণয়ীর আবেগ আর ঔজ্জ্বল্য যোশী সাহেবের মুখে।

চন্দ্রাবতী ওর কথার উত্তর দেন না। সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেন, 'আচ্ছা মিস্টার যোশী, আপনি যে বন্দুক কিনবেন বলেছিলেন?'

'ওঃ মিসেস চন্দ্রাদেবী, অ্যাপ্লাই করেছি। পেয়ে যাব শীঘ্রি, ছিল তো আগে লাইসেন্স। আপনি বুঝি শিকার দেখতে খুব উৎসুক?'

চন্দ্রাবতী হেসে উঠে বলেন, 'দেখতে নয় মিস্টার যোশী, শিকার হতে।'

যোশী সাহেব হতভম্ব হয়ে বলেন, 'কী বলছেন?'

'বলছি হাতের কাছে বন্দুক থাকলে গুলি খেয়ে দেখতাম।'

'চন্দ্রাদেবী!' যোশী সাহেব একটা অসমসাহসিক কাণ্ড করে বসেন, হঠাৎ চন্দ্রাবতীর একটা হাত চেপে ধরে বলেন, 'এ আপনি কী বলছেন?'

চন্দ্রাবতী হেসে উঠে বলেন, 'ঠিকই বলছি। বুড়ো হয়ে যাবার আগেই তো মরে যাওয়া ভাল।'

যোশী সাহেব গাঢ় কণ্ঠে বলেন, 'বুড়ো হতে আপনার এখনো অনেক দেরী আছে চন্দ্রাদেবী। আপনি বয়েসকে জয় করতে পারেন, বয়েসকে ভুলিয়ে দিতে পারেন। এই তো আমি—'

যোশী সাহেব আরো আবেগপূরিত গলায় বলেন, 'আমিও তো ভেবেছিলাম জীবনের সব লেন-দেন চুকিয়ে ফেলেছি, এখন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা। আপনি আমার সেই মৃত-হৃদয়ে জীবন সঞ্চার করলেন, আমাকে আবার বাঁচবার প্রেরণা দিলেন—'

চন্দ্রাবতী হাতের উপর থুঁতনীটা রেখে শুনছিলেন সব কথা। এবার বলেন, 'এ সব কবে করলাম বলুন তো?'

'আপনি কি করে জানবেন?' নবপ্রণয়ীর গলা আরো গাঢ় হয়ে আসে, 'সূর্য কি জানে সে কোথায় আলো দিচ্ছে।'

'কিন্তু আগে আপনি আমায় দিদি ডাকতেন।'

'সে কথা আর মনে করিয়ে দেবেন না চন্দ্রাদেবী! তার জন্যে আমি লজ্জিত, বিশ্বাস করুন আমি কেবল আপনার সম্মানার্থেই—'

'আচ্ছা বিশ্বাস করছি।' চন্দ্রাবতী একটি তীক্ষ্ণ কটাক্ষের সঙ্গে বলেন, 'মিস্টার যোশী, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব ঠিক উত্তর দেবেন?'

'একটা কেন, একশোটা প্রশ্ন করুন চন্দ্রাদেবী! সাধ্যমতো উত্তর দেব।'

'সাধ্যমতো!' চন্দ্রাবতী আর একটু হাসেন, 'আচ্ছা তাহলে প্রথমে সাধ্যের কথাটাই জিজ্ঞেস করি। মিস্টার যোশী, আপনি আমায় নিয়ে পালিয়ে যেতে পারেন?'

'পালিয়ে যেতে!' যোশী সাহেবের মুখটা হাঁ হয়ে যায়।

চন্দ্রাবতী কিন্তু অবলীলায় বলেন, 'হ্যাঁ পালিয়ে! অনেক দূরে কোথাও! পাহাড়ে জঙ্গলে! ধরুন যে জঙ্গলে বাঘ থাকে। বন্দুকটা ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়বেন শিকারে, আমি থাকব আপনার সঙ্গে সঙ্গে—'

যোশী সাহেব উত্তেজিতভাবে বলেন, 'বুঝতে পারছি, আপনি আমার পূর্বজীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েই একথা বলছেন, কিন্তু আপনি পারবেন কেন অত কষ্ট সইতে? আপনি সারাজীবন

এই শহরে লালিত হয়েছেন, এখন এই বয়েসে—' বয়েস শব্দটা উচ্চারণ করেই থেমে যান যোশী সাহেব।

চন্দ্রাবতী মৃদু হেসে বলেন, 'বয়েস মনে করিয়ে দেবেন না মিস্টার যোশী, তা' হলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আমার। চিরকাল শহরে আছি বলেই তো জঙ্গলের প্রতি আকর্ষণ। তা ছাড়া জানেন তো আমাদের সমাজ? এই যে আপনার সঙ্গে মেলামেশা করি, সমাজ কি ভাল চক্ষে দেখে? দেখে না। তাই মনে হয়, হয় আপনার সঙ্গে সব পরিচয় মুছে ফেলে অপরিচিতের মতো থাকতে হবে, নয় তো কোথাও পালিয়ে গিয়ে—'

যোশী সাহেব উত্তেজিতভাবে বলেন, 'কেন? পালাতে যাবেন কেন? আপনার হাজব্যাণ্ড সাধু হয়ে গেছেন, আপনি নিশ্চয় ডাইভোর্স পেতে পারেন। আইন আপনার সহায়।'

'তাই নাকি?' চন্দ্রাবতীও উত্তেজিতের ভূমিকা অভিনয় করেন, 'সত্যি? আইন আমার সহায়?'

'নিশ্চয়!'

'ও তাহলে তো কোন কথাই নেই! আইন আমার সহায়, তবে আর পালাবার দরকার নেই। কী বলেন?'

'না, নিশ্চয় নয়।' যোশী সাহেব আর বাধা মানেন না। অথবা মানবার প্রয়োজন বিবেচনা করেন না। তাই চন্দ্রাবতীর পিঠের উপর একটা হাত রেখে মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে গদগদ গলায় বলেন, 'বলেছি তো আইন আমাদের সহায়। পালিয়ে যাব কেন? চলুন কালই একজন ল-ইয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করা যাক। আমারই একজন বন্ধু আছেন—'

চন্দ্রাবতী কৌশলে নিজেকে সরিয়ে নেন। সহসা তিনি অনুভব করেন যে আগুনের ডেলাটা জ্বলে জ্বলে নিভে গেছে, তাকে আর জ্বালিয়ে তোলা যায় না। বাতাস দিয়ে জাগাতে গেলে সে শুধু ভস্মকণাই ছড়ায়।

চন্দ্রাবতী তাই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'হঠাৎ ভারী টায়ার্ড ফিল করছি মিস্টার যোশী, একটু একা থাকতে পেলে বড় ভাল হতো।'

মিস্টার যোশী গালের উপর চড় খান যেন।

এ কি। মহামুহূর্তে এ কি নিষ্ঠুর বাণী। কাতর গলায় বলেন, 'চন্দ্রাদেবী, আমি কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি না? কোন সেবা শুশ্রূষা?'

'লাগবে না, ওসব কিছু লাগবে না মিস্টার যোশী, শুধু—।'

খাল কেটে কুমীর আনলে সে কুমীর কি সহজে যায়? আহার পেতে চায় বৈকি। যোশী সাহেবও যদি আহারের আশায় তীর ছাড়তে না চান, দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে। কুমীর তো তার লোভের বাহু বাড়াবেই।

কিন্তু চন্দ্রাবতী কুমীর চাননি, চেয়েছিলেন বাঘ। চেয়েছিলেন নিজের শক্তির ওজন যাচাই করতে। লোকভয়ে ভীত চন্দ্রাবতী সহসা বিদ্রোহী হয়ে উঠে চেয়েছিলেন লোকচক্ষুকে অস্বীকার করতে। আর চেয়েছিলেন বিজয়িনী হতে। যে পদ্মাকে চোখে দেখেননি, তার সৌভাগ্যে ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করেছেন চন্দ্রাবতী, তার উপর জয়ী হতে চেয়েছেন।

কিন্তু কাকে নিয়ে সেই জয়? ভস্মপুতুলকে নিয়ে? যে পুতুল অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধোঁকা দেয়, একটা টোকা মারলেই ঝরে পড়ে?

পদ্মাকে এখন বড় জোর করুণা করতে পারেন চন্দ্রাবতী। করুণা করতে পারেন এক টুকরো রুমালের ঝাপটে তাকে মুছে ফেলতে পারা গেল বলে।

চন্দ্রাবতী তাই ভুরু কোঁচকালেন। কুমীরের বেয়াদপি অসহ্য মনে হলো। বললেন, 'মিস্টার যোশী, আপনার কাছে এর থেকে ভদ্র ব্যবহার আশা করেছিলাম।'

না, যোশী সাহেব সিংহ মূর্তিতে কেশর ফুলিয়ে বিশাল হয়ে উঠলেন না, বললেন না ঘুমন্ত পশুকে জাগিয়ে তুললে তার খাদ্য জোগান দিতে হয়। বললেন না, তুমি কি তবে আমাকে নিয়ে শুধু খেলাতেই চেয়েছিলে? না কি ভেবেছিলে লোকটা হতভাগা একটা ভিখিরি বৈ তো নয়, মুষ্টিভিক্ষাতেই কৃতার্থ থাকবে!

এমন অনেক কথাই তো বলতে পারতেন যোশী সাহেব। বলবার অধিকার তাঁর ছিল। আর সে কথা বলতে পারলে হয়তো বা চন্দ্রাবতীর জীবনের গতি অন্য এক মোড় নিয়ে বসত!

কিন্তু যোশী সাহেব সিংহের মূর্তিতে রুদ্র হয়ে উঠলেন না। 'ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করবেন, হঠাৎ কি রকম আত্মহারা হয়ে গিয়ে—' বলে মার খাওয়া কুকুরের মতো মাথা নীচু করে প্রায় ছুটে যান।

চন্দ্রাবতী তাকিয়ে থাকেন। ওই পলায়নপর লোকটাকে ভারী হাস্যকর ঠেকে।...আর তারপর তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজেকেও অদ্ভুত হাস্যকর লাগে চন্দ্রাবতীর।

ওই হাস্যকর লোকটাকে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে আসবার স্পর্ধা জোগাল কে? চন্দ্রাবতীর প্রশ্রয় না পেলে কি সাধ্য ছিল ওর?

প্রশ্রয় দিয়েছেন, ওকে আয়ত্তে আনতে পারার সুখটাকে মূল্য দিয়েছেন। এর চাইতে হাস্যকর আর কি আছে?

কিন্তু কেন এত হাস্যকর করেছেন নিজেকে? সে কি শুধুই পদ্মার উপর হিংসের ফল? শুধুই অনুপস্থিত নিশিকান্তর উপর প্রতিশোধ নেবার দুষ্ট বাসনা? আর কিছু নয়?

হয়তো ওইগুলোকেই কারণ বলে ধরে মনকে চোখ ঠেরেছেন চন্দ্রাবতী, তবু আছে আরও কারণ। চন্দ্রাবতী সহসা সে কারণকে দেখতে পাচ্ছেন, তাই নিজেকেও ভারী হাস্যকর ঠেকছে।

চন্দ্রাবতীর ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে আসছে, তাই নিঃশেষ হয়ে আসছে চন্দ্রাবতীর এই সংসারের অন্নজল। চন্দ্রাবতী অতএব একটা

অবলম্বনের জন্যে হাতড়াচ্ছেন। যাকে ধরে চন্দ্রাবতী তাঁর এই অভ্যস্ত জীবনেই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পান।

অবশ্যই মূর্খ যোশী সাহেবের মতো বিয়ের কথা ভাবেননি চন্দ্রাবতী, কিন্তু কিছুটা প্রশ্রয়ের মূল্যে কিছুটা সুবিধে আদায়ের আকাঙ্ক্ষা অবচেতনায় ছিল না কি? যোশী সাহেবের সঙ্গে লম্বা লম্বা প্রমোদ ভ্রমণের বিনিময়ে যোশী সাহেবের টাকায় মার্কেটিং হচ্ছে না? যোশী সাহেবের উপহারে নতুন করে গৃহসজ্জায় বৈচিত্র্য আসছে না?

ফেরার সময়ে চন্দ্রাবতী শুধু এক-আধবার বলেন, 'একটু শীঘ্র ফিরতে হবে মিস্টার যোশী, আমার আবার একটু মার্কেটিং আছে—'

যোশী সাহেব চন্দ্রাবতীর সেই মার্কেটিংয়ের ভার নিয়ে ধন্য হন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুতে বোঝাই হয়ে যায় ঝুড়ি, সাজি। প্যাকেট ওঠে জমে। কত কতদিন একঘেয়ে পর্দাগুলো ঝুলে মরছিল দরজায় জানলায়, যোশী সাহেবের মুক্তহস্তের বদান্যতায় নতুন পর্দা ঝলমলাচ্ছে।

মেঝেয় পাতা বিবর্ণ হয়ে আসা কার্পেটটার বদলে নতুন বর্ণচ্ছটায় সমৃদ্ধ একখানা কার্পেটের আকাঙ্ক্ষা কতদিন থেকে, হয়তো সেটারও সুরাহা হয়ে যাবে। এই সুবিধেগুলোর প্রত্যাশায় ওই হাস্যকর জীবটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী তবে নিজে কি?

অভ্যস্ত জীবন!

চন্দ্রাবতীর অভ্যস্ত জীবনের রূপ কি? সকাল থেকে রাত্রি অবধি নিজেকে স্টেজে দাঁড় করিয়ে রাখা, এই জীবন চন্দ্রাবতীর। সেই জীবন ক্রমশই গ্রাস করে চলেছে চন্দ্রাবতীর সমস্ত সত্তাকে। গ্রীন্‌রুমের স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে গেছেন চন্দ্রাবতী, যেখানে গিয়ে অন্তত পরচুলটা খুলে রাখা যায়। মেক্‌-আপটা তুলে ফেলা যায়।

প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে শুধু মেক্‌-আপই তো সম্বল চন্দ্রাবতীর। রাত্রে ঘুমুতে যাবার আগেও—গরম জলে মুখ ধুতে হয় চন্দ্রাবতীকে,

মুখের পেশীতে ম্যাসাজ করতে হয়, কৌটো আর শিশিতে ভরা রূপের প্রলেপ লাগাতে হয় মুখে-চোখে চুলে-নখে। যাতে সকালে উঠে তাজা দেখায়, তরুণী দেখায়।

সেই দেখানোটায় লাভ কি? এটা কোন দিন খেয়ালে আসে না। খেয়ালে আসে না বলেই, সেটাকেই পরম লাভ জেনে সব চিন্তাকে নিয়োজিত করছেন সেইখানে। সব লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত আছে সেখানে।

এই জীবন! নিজেকে সাজিয়ে সাজানো ড্রইংরুমে বসে থাকা।

চন্দ্রাবতী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সেই ড্রইংরুম।

দেখেন সোফা-সেটি, টেবল ফুলদানী, টিউবলাইট, পেডেস্ট্যাল ফ্যান, ক্যাকটাস অ্যাকোয়েরিয়াম। দেখেন পুতুল খেলনা, ছবি কাঁচ, মাটি, প্লাস্টিক, ঝিনুক! চন্দ্রাবতীর এই সংগ্রহশালায় আরো কত তুচ্ছের পাহাড়!

এই হচ্ছে চন্দ্রাবতীর সারাজীবনের সঞ্চয়। চন্দ্রাবতীর মূল্য-বোধের নমুনা। চন্দ্রাবতীর স্বপ্ন আর সাধনার প্রতিকৃতি। কী হাস্যকর! কী হাস্যকর!

চন্দ্রাবতীর সংগ্রহশালায় অনেক দুর্লভ বস্তুও আছে।

অন্তত চন্দ্রাবতী তাদের দুর্লভ বলেই গণ্য করে এসেছেন। সেই দুর্লভদের এক একটির পিছনে আছে এক একখানি ইতিহাস। এর মধ্যে বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া উপহার আছে, আদর কাড়িয়ে আদায় করা আছে, দোকানীর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা বচসা করে আর মিনতি করে বাগানো আছে, আছে আরো বহুবিধ পন্থার ইতিহাস।

নিজেকে খেলো করার, নিজেকে ছোট করার, নিজেকে হ্যাংলা আর বিরক্তিকর করে তোলার সেই পদ্ধতিকে বাহাদুরী ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন চন্দ্রাবতী। আর সেই বাহাদুরীর ফল-গুলিকে আগলে বসে আছেন প্রাণপণে।

এইগুলোর মধ্যে নিজেকে বজায় রাখবার চেষ্টায় প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

কারণ এই জড়বস্তুগুলোরই নাম দিয়েছেন চন্দ্রাবতী সভ্যতা, সৌন্দর্য, রুচিবোধ। তাই এগুলোকে আঁকড়ে বসে থেকে ভেবেছেন সভ্যতাকে আঁকড়ে আছি, সৌন্দর্যকে আঁকড়ে আছি, রুচিবোধকে আঁকড়ে আছি। চন্দ্রাবতীর ননদ যেমন তার আচার আর অনুষ্ঠান-গুলোকে আঁকড়ে ধরে বসে থেকে ভাবে ভগবানকে আঁকড়ে আছি।

চন্দ্রাবতী ওই আত্মপ্রতারণা দেখে কৌতুক বোধ করে এসেছেন। ভেবেছেন ওর ওই গোবর-গঙ্গাজল সংক্রান্তি-পূর্ণিমা কী ঠকানটাই ঠকাচ্ছে ওকে!

অথচ চন্দ্রাবতীও হাস্যকর ভাবে ঠকে আসছেন জীবনভোর। এই জড়বস্তুগুলো চন্দ্রাবতীকে ঠকিয়ে এসেছে। এরা চন্দ্রাবতীর স্নেহ-মমতা বন্ধন-সংস্কার পরিবেশ-পরিজন স্বামী-সংসার সব কিছুর থেকে খাজনা আদায় করেছে। চন্দ্রাবতীকে হাড়পেশা খাটুনী খাটিয়েছে, সতর্কদৃষ্টির পাহারা আদায় করেছে, আর চন্দ্রাবতীর জীবনের সব শিকড় থেকে আহরণ করা রসে পুষ্ট হয়ে চন্দ্রাবতীর সমগ্র অস্তিত্বের উপর চেপে বসে থেকেছে। আর চন্দ্রাবতী নিজেকে নিশিকান্তর থেকে, নিশিকান্তর বোনের থেকে বুদ্ধিমান ভেবেছেন।

অদ্ভুত! অদ্ভুত!

এর থেকে অদ্ভুত আর কী আছে? এরচেয়ে বোকামী আর কী আছে?

আচ্ছা, চন্দ্রাবতী ওদেরকে এই চালাকীর শাস্তি দিতে পারেন না?

ধূলোর স্তরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকার জন্যে ফেলে রেখে চলে যেতে পারেন না চিরকালের মতো? দেখিয়ে দিতে পারেন না ওদের সাহায্য ব্যতীতও বজায় থাকতে পারে চন্দ্রাবতীর সভ্যতা সৌন্দর্য রুচিবোধ।

তাই, তাই করবেন চন্দ্রাবতী। জব্দ করবেন এদের। অনায়াসে তুচ্ছ করে ব্যঙ্গ করে যাবেন এই প্রতারকগুলোকে।

চন্দ্রাবতী ভয়ানক একটা উল্লাস বোধ করেন।

চন্দ্রাবতী দেখতে পাচ্ছেন তাঁর ফ্ল্যাটের দরজায় একটা বড় তালা ঝুলছে।

চন্দ্রাবতী দেখতে পাচ্ছেন সেই তালার সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়া যোশী সাহেবের হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ।...দেখতে পেয়ে ঈষৎ করুণাবোধ করলেন চন্দ্রাবতী।

চন্দ্রাবতী ওকে শবসাধনার আসন থেকে টেনে তুললেন, জীবন-সাধনার সন্ধান দিতে পারলেন না।

কিন্তু চন্দ্রাবতী? চন্দ্রাবতীও নিজের জন্যে কি পেয়েছেন সে সন্ধান?

চন্দ্রাবতী নিজেও তো শবসাধনাই করেছেন বসে বসে। নিভে যাওয়া আগুনে সমিধ জুগিয়ে চলেছেন। জীবনের সর্বস্ব জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে বসেছিলেন চন্দ্রাবতী, টের পাননি কবে কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সেই আগুন। টের পাননি লোকের কাছে কি হাস্যকর লেগেছে চন্দ্রাবতীর সেই ভস্মাধারটা কোলে নিয়ে বসে থাকা।

অথচ তাই থেকেছেন চন্দ্রাবতী, বসে থেকেছেন, আর ভেবেছেন তাপ পাচ্ছি, আলো পাচ্ছি, সেই আলোয় উজ্জ্বল হচ্ছি।

আজ কি তবে চন্দ্রাবতী সেই ভস্ম ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন?

তাই অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে উঠলেন। শোবার ঘরে চলে এলেন, পাতা বিছানাটার দিকে তাকালেন। সুন্দর বেড্‌কভার ঢাকা আরামের শয্যা। চোখ ফিরিয়ে নিলেন।...

আলমারিটা খুলে তাকিয়ে থাকলেন গোছা গোছা শাড়ি-

ব্লাউজ সায়া-রুমাল ব্যাগ-বটুয়ার দিকে, এর থেকে দু-একটা কি ভরে নেবেন ছোট্ট একটা স্যুটকেসে? তারপর নেমে যাবেন সেইটা নিয়ে, দরজায় তালা লাগিয়ে? যে তালাটা দেখে যোশী সাহেব—

আলমারিটা খোলা পড়ে রইল, একটা তালাচাবি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন চন্দ্রাবতী।

এসব জিনিস্ হেনা রাখত, হেনা নেই। চাকরটা রাত্রে বাসায় শুতে যায়, জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই। অনেকক্ষণ খুঁজলেন, সারা বাড়ির সর্বত্র ঘুরে বেড়ালেন। খুঁজে পেলেন না।

তাহলে? তাহলে হবে না? যাদের ফেলে চলে যাচ্ছেন, তাদের জন্যে তালাচাবি খুঁজে না পেয়ে যাওয়া বন্ধ করবেন?

হঠাৎ একটা মৃদু হাসির ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল চন্দ্রাবতীর মুখে।

সামনের জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, দেখলেন রাত শেষ হয়ে গেছে, সামনের আকাশটা লালচে হয়ে উঠেছে।...যে অগ্নি-গোলকটা গত সন্ধ্যায় জ্বলে জ্বলে নিভে কালো হয়ে গিয়েছিল, তার অবসন্ন হৃৎপিণ্ডে আবার দেখা দিয়েছে নতুন চেতনা।

ওই আকাশেই আবার আজকের সূর্য উঠবে।

সেটা হবে নতুন সূর্য!

অথচ নিজের কেন্দ্রে অবিচল থাকবে সে।

নতুন আকাশের প্রয়োজন অনুভব করবে না।

শেষ